নোট –

১। BornomalaBN font ব্যবহার করা হয়েছে।

২। শুরুতে যুক্ত করতে হবে, আরবী আলোচনার অডিও বা টেক্সট লিঙ্ক (যেটা পাওয়া সম্ভব)। শায়খের আলোচনার সময়কাল (হিজরি কতো সনে, ইংরেজি কতো সনে) তা যুক্ত করতে হবে।

৩। কুরআন ও হাদিসের আরবী ইবারত যুক্ত করতে হবে

৪। কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে টীকা যুক্ত করতে হবে। সংক্ষেপে। অর্থাৎ - নাম, মৃত্যু সাল, জীবিত থাকলে জন্মসাল, জন্মভূমি, তার সংগঠন/অবস্থান/অবদান। যেসব ক্ষেত্রে এ ধরণের তথ্য যুক্ত করতে হবে, আমি সেখানে "সংক্ষিপ্ত টীকা" লিখে দিয়েছি।

৫। কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটু বিস্তারিত টীকা দিতে হবে। যেখানে #৪ এ উল্লিখিত বিষয়ের পাশাপাশি তাদের অবদান ও কর্মকান্ড নিয়ে কিছু তথ্য আসবে। এমন ব্যক্তির উদাহরণ – মুহাম্মাদ সুরুর, সাফর আল হাওয়ালি, রমাদ্বান বুতি। আমি এসব ক্ষেত্রে "বিস্তারিত টীকা" লিখে দিয়েছি।

৬। কিছু ক্ষেত্রে "কথার সূত্র" উল্লেখ করতে হবে। আমি চিহ্নিত করে দিয়েছি।

৭। কিছু ক্ষেত্রে আলোচনার ধারাবাহিকতা বুঝার জন্য সংক্ষিপ্ত টীকা উল্লেখ করতে হবে। চিনহিত করে দিয়েছি

৮। কিছু ক্ষেত্রে অনুবাদের বক্তব্য পরিষ্কার না হওয়াতে মূল আরবীর সাথে মিলিয়ে দেখা জরুরী। চিনহিত করা হয়েছে।

৯। কিছু ক্ষেত্রে হলুদ মার্ক করা হয়েছে কিন্তু কোন মন্তব্য যুক্ত করা হয়নি। এগুলো উপেক্ষা করে যাবেন। এটি পরবর্তী সম্পাদনার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

مقومات التنظيم و دور المنهج

সংগঠনের উপাদান ও মানহাজের ভূমিকা

[ক্রুসেড-জয়ানিষ্ট জোটের অংশসমূহ]

পূর্বের দরসে আলোচনা করেছি ইখওয়ানুল মুসলিমীন সম্পর্কে। সেখানে বলেছিলাম, ইসলামী আন্দোলনের পূর্বের মারহালাটি তিনটা ধারায় গিয়ে বিভক্ত হয়েছে: গ

ণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী কার্যক্রমের ধারা,

জিহাদী ধারা এবং

তাকফীরী ধারা।

সেখানে আমরা বলেছি, তাকফীরী ধারা গত মারহালাতে[১] অনেকটাই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইসলামী বিশ্বের জন্যে আমেরিকার কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র সমাধান হল, গণতান্ত্রিক ধারা। আমেরিকান থিংক ট্যাঙ্কগুলো ইসলামীপন্থীদের পার্লামেন্টে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করছে। তাদেরকে বুঝাচ্ছে, যদি তোমরা কাজ করতে চাও তাহলে পার্লামেন্ট ছাড়া তোমাদের আর কোন রাস্তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই এখানে অনেক অসংগতি রয়েছে এবং তাদের সামনে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে:

জিহাদী ধারার সাথে গনতান্ত্রিকদের অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে তিনটা ভাগ রয়েছে:

- প্রথম অংশ হচ্ছে, গণতান্ত্রিক দলগুলোর এমন সদস্য যারা মুজাহিদ এবং দখলদার পশ্চিমা ধারার মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে ময়দানে কাজ

---

[১] গত মারহালা বলতে শায়খ কী বুঝাচ্ছেন? পাঠকের কাছে পরিষ্কার না। এটি সংক্ষেপে ৩-৫ লাইনের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে।

করছে[২]। এদের অধিকাংশ কাজগুলো ভাল বা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক না। এই ধরনের লোকেরা খুব দ্রুত গণতান্ত্রিক ধারা থেকে পৃথক হয়ে জিহাদী ধারার সাথে ময়দানে প্রবেশ করে -যেমনটা আমরা দেখছি- আল্লাহু আ'লাম। তাই আমরা এই অংশকে কিছুটা প্রেরণা যোগাই।

- দ্বিতীয় প্রকার; তারা হচ্ছে মধ্যম স্তরের নেতৃত্ব, তারা সংগঠন থেকে পাওয়া চিন্তাধারা এবং আমেরিকার নির্যাতন ও দখলদারিত্বের বিপরীতমুখী পরিবেশে বসবাস করে। তাদের অধিকাংশরাই এই বৈপরীত্যের মাঝে থেকে মধ্যপন্থায় ফিরে আসবে।[৩]
- বাকি রয়েছে সেই সমস্ত নেতৃত্ব, যাদের সাথে প্রশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যাদের সমস্ত স্বার্থ পশ্চিমাদের উপস্থিতি ও ত্বাগুত প্রশাসনের অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। এই প্রকারের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে তারা পশ্চিমা বাহিনী ও তাগুত্ব বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্যপকভাবে জিহাদী ধারার বিপরীত বাহিনীর সাথে কাজ করবে।

পশ্চিমাদের দখলদারিত্বের অবস্থা চলমান থাকলে সামনের বছরগুলোতে জিহাদী ধারা এবং পশ্চিমা ধারার মাঝে সংঘাত ব্যপক হবে। তখন পশ্চিমা মদদপুষ্ট ধারা প্রশাসন, কিছু ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কিছু উলামার সাথে বন্ধুত্ব হবে। তারা সকলে এই ধারার (পশ্চিমা মদদপুষ্ট ধারার) সাহায্যকারী হবে।

বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ মারহালার শেষে চার ধরণের শত্রুর মুখামুখি হব। এই কথাগুলো আমাদেরকে এখনই স্পষ্ট করে বলতে হবে, কেননা এই সমস্যার শাখা-প্রশাখা এখন থেকেই ছড়ানো শুরু হয়েছে। এই শত্রুগুলো বৈশ্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত জোটের অংশ।

সেই জোটের প্রথম স্তরে থাকবে ইয়াহুদী ও ক্রুসেডাররা। ইয়াহুদীরাই হবে নেতা, পরিকল্পনাকারী ও এই জোটের পরিচালক; তারা তো পশ্চিমাদেরকেও পরিচালনা করে। তবে অবশ্যই এই জোটের প্রত্যেক অংশের নিজস্ব কিছু স্বার্থ থাকবে। পশ্চিমা ধারার স্বার্থ হবে; কিছু অর্থনৈতিক স্বার্থ, মিশনারী ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রসার।

---

[২] কথাটি স্পষ্ট নয়। তারা আদর্শিকভাবে এ দুইয়ের মাঝখানে? নাকি অন্য কোন অর্থে এসেছে?

[৩] বক্তব্য স্পষ্ট নয়। ত্রিশ বছর আগের কথা। বর্তমানে প্রযোজ্য না

খ্রিষ্ঠান ধর্ম বর্তমানে বিশ্বাস পশ্চিমা জগতে বিলুপ্তির পথে। যারাই পশ্চিমে বসবাস করেছে বা তাদের জনগণের সাথে মিশেছে তারা সবাই জানে, পুরো পশ্চিমা বিশ্বের মানুষের মধ্যে ইসায়ী ধর্মের তেমন কিছুই বাকি নেই, অল্প কিছু কট্টর পাদ্রী ব্যতিত।

আলী বিন আবী ত্বালেব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

(বনী তাগলিব গোত্রের খৃষ্টানদের জবাইকৃত জন্তু খাবে না। কেননা তারা তাদের ধর্ম থেকে মদ্যপান ব্যতিত সবকিছু বাদ দিয়ে দিয়েছে।)[৪]

অর্থাৎ এই সাহাবী তাদের গোশত ও জবাইকৃত জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন, কেননা তারা আহলে কিতাব থেকে মুশরিকে পরিনত হয়েছে। তাহলে বর্তমান আহলে কিতাবীদের কি অবস্থা যাদের মধ্যে অল্প কিছু খৃষ্টীয় চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছু বাকি নেই?

মানুষের সাথে লড়াই করার জন্যে তাদের একটা জোটের দরকার ছিল, যেই জোট দিয়ে তারা যুদ্ধ করবে। ইয়াহুদী ও ক্রুসেডাররা এই জোট তৈরি করেছে। তাই তারাই শত্রুতার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে।

জোটের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে সেই সব প্রশাসন যাদের স্বার্থ সরাসরি ইহুদী-খ্রিস্টান জোটের সাথে সংযুক্ত। যাদেরকে আদেশ করার হয় তাদের চেহাড়াগুলো যেন কাদার মধ্যে মিশ্রিত করে।[৫] যেমনটা বর্তমান সেইসব শাসক যারা শান্তি সম্মেলনে গিয়ে থাকে। (মুসলিম ভূখন্ডগুলোর শাসক)। যদি তাদেরকে সেখানে যাওয়া বা না যাওয়ার স্বাধিনতা দেওয়া হত, আমি মনে করি তারা না যাওয়াকে প্রাধান্য দিবে। কেননা এই সম্মেলনগুলোতে তাদেরকে সম্পূর্ণ ঝুলন্ত রাখা হয়। দখলদারদের স্বার্থ রক্ষাই এখন এই শাসকদের মূল কাজ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

এই সমস্ত শাসকরা সরাসরি মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। জোটের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে এরাই পরিচালনা করে; যারা হচ্ছে মুনাফিক আলেম এবং আমেরিকান মতাদর্শে পরিচালিত গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলো। আমেরিকা

---

[৪] আরবী ইবারত ও সূত্র

[৫] স্পষ্ট নয়। এটি কি আরবী কোন প্রবচন?

ইসলামী বিশ্ব ও আন্দোলনগুলোকে একটি বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে চায়। আর তা হচ্ছে, "যদি তোমরা টিকে থাকতে চাও তাহলে পার্লামেন্টে যাও"। আর তারা এই গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে টিকে থাকার মূল্য হিসেবে নিজেদের আকিদাহ, অবস্থান, আদর্শ পুরুষত্ব, সাহসিকতাসহ সব বিসর্জন দেয়।

গণতান্ত্রিক দলগুলোর অধিকাংশ নেতৃত্ব আলেম নয়; ফলে সংগঠনের যুবকদের উপর তাদের রুহানি কোন কর্তৃত্ব নেই, কারণ তারা আলেম ছাড়া অন্য কারোর কাছ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করে না। তাই মুরতাদ প্রশাসন এমন কিছু আলেমকে এনে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন গুলোর সাথে সংযুক্ত করে; যারা এই প্রশাসনের পক্ষে অবস্থান নেয়; যাদের মূল কাজ আমেরিকা ও পশ্চিমাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া।

সুতরাং ভবিষ্যতে জিহাদী ধারার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী সম্ভাব্য ফ্রন্ট হচ্ছে এই জোট যেখানে প্রথমে রয়েছে –

ইয়াহুদী-খ্রিষ্ঠান,

তারপর শাষক,

তারপর গৃহপালিত ইসলামী দলগুলো বা সেই সমস্ত ইসলামী দলের নেতা যারা গণতন্ত্র ও পশ্চিমা চক্রান্ত গ্রহণ করে নিয়েছে,

অতঃপর সেই সমস্ত আলেম যারা এই ফ্রন্টের খেদমত করে।

সংগঠনের উপাদান সমূহ

সামগ্রিকভাবে জিহাদ মূলত জামাতবদ্ধ ইবাদত। কিছু ইবাদত ব্যক্তিগত ভাবে আদায় করা হয় আর কিছু ইবাদত সাংগঠনিক ভাবে আদায় করা হয়। ঈদের নামাজ, জুমার নামাজম এগুলো জামাতবদ্ধ ইবাদত। এগুল একজন ইমামের অধীনে, নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা, নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করা হয়। সামগ্রিকভাবে জিহাদও একটি জামাতবদ্ধ আমল ও জামাতবদ্ধ ইবাদত। যার জন্য শৃঙ্খলা, আনুষ্ঠানিকতা, ইমাম এবং বাইয়াত প্রয়োজন। বর্তমানে যারা সাংগঠনিক কার্যক্রমে লিপ্ত তাদের কাছে এই কথাগুলো একেবারেই স্পষ্ট।

ব্যক্তিগতভাবেও জিহাদ করা সম্ভব; যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন; (আপনি একাই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করুন, আপনি আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে মুকাল্লাফ নয়)।

জিহাদ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিষয়গুলো যখন মানুষ দলগতভাবে আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাদের থেকে উজুব চলে যায় না। বরং তাদের উপর তখন ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা ফরয হয়ে যায়। তাই জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা এবং আজকের আলোচনায় আমদের কথা হবে জিহাদের ইবাদতের জামাতবদ্ধ অবস্থা নিয়ে।

জিহাদের ইবাদত দলগত ভাবে আদায় করতে হলে তার জন্য একটি সংগঠন আবশ্যক। এখন আমরা এই সংগঠনের মূল উপাদান গুলো নিয়ে কথা বলবো; অর্থাৎ কখন আমরা মুজাহিদদের জমায়েতকে তানজীম বা সংগঠন বলতে পারব এবং কখন আমরা বলবো তারা এটা সংগঠন নয় বরং এটি জিহাদিদের একটি জমায়েত, দল বা গোষ্টি। বর্তমানে আমরা যে সমস্ত জিহাদী দল দেখি তাদের বেশ কিছুর মধ্যে গোত্রীয় বৈশিষ্টের বাহিরে ভিন্ন কোন বৈশিষ্ট নেই।

আমরা আজ যে বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে একটি সংগঠনের অনুকরণীয় নমুনা কেমন হবে। আর আলোচনার মাধ্যমে ইচ্ছা হচ্ছে, সকল সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ সীমানায় থেকে এই মূল উপাদানগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাবে। সে নেতৃত্বের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করবে এবং তাদেরকে পরামর্শ দিবে।

তাদেরকে বলে;

“হে জামাআহ, আমরা একটি সংগঠন হিসেবে কাজ করছি। আর প্রত্যেকটা সংগঠনের কিছু মৌলিক উপাদান থাকা আবশ্যক। যা কাজের পরিবেশ ও পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি দেয়া ব্যতিতই বাস্তবায়ন করতে হয়।

আমরা এখানে যুদ্ধ করছি নাকি সেখানে যুদ্ধ করছি?

আমরা কি প্রকাশ্যে যুদ্ধ করছি নাকি গোপন যুদ্ধ করছি?

আমরা কি আফগানিস্তানের যুদ্ধ করছি নাকি মিশরের যুদ্ধ করছি?

মূল উপাদান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এগুলো লক্ষ করা হবে না।[৬]

কোন সংগঠনের মধ্যে যদি এই মৌলিক উপাদান গুলো উপস্থিত না থাকে, তাহলে আসবাবের জগতে আমরা বলতে পারি; এই সংগঠন কখনোই সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনতে পারবে না যার জন্য তারা একত্রিত হয়েছেন, আল্লাহু আলাম। (আল্লাহ তা'আলার তাউফীকের জগত ভিন্ন, যেখানে শুরু ও শেষ সবই তাউফীক)।

এই নমুনা অনুযায়ী সাংগঠনিক উপাদানগুলো পূর্ণতা লাভের জন্যে প্রয়োজন ইচ্ছা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম; যেখানে নেতৃত্বের শক্তি দায়িত্ব বাস্তবায়ন কারীদের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। যেহেতু স্বাভাবিকত সাংগঠনিক কার্যক্রম একটু কঠিন, তাই যদি দৃঢ় সংকল্প না থাকে তাহলে পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সংগঠনের প্রথম উপাদান হচ্ছে মানহাজ। এটা নিয়ে দীর্ঘ ব্যাখ্যা করব, কেননা এটাই আলোচনার মূল অংশ।

একটি সংগঠনের মূল উপাদান হচ্ছে চারটিঃ-

প্রথম উপাদানঃ চিন্তাধারা ও মানহাজ

চিন্তাধারা ও মানহাজ হচ্ছে, এমন কিছু বিশ্বাসের সমষ্টি যা কোন সংগঠন গ্রহন করে থাকে। যার ভিত্তিতে সেই সংগঠনের সাথে অন্যান্য সংগঠনের পার্থক্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ আফগানিস্তানে অবস্থা হচ্ছে এখানে অনেক জিহাদি দল আছে যাদের কোনো স্পষ্ট চিন্তাধারা বা মানহাজ নেই। তবে এক্ষেত্রে ভিন্ন হচ্ছে যে সমস্ত জামাত আফগানিস্থানে আসার পূর্ব থেকেই সংগঠন হিসেবে ছিল এবং তারা তাদের মূল ভিত্তিসহ এখানে এসেছে। কিন্তু যে সমস্ত দলগুলো এখানে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই অস্ত্র ধারণ করেছে, যুদ্ধ শুরু করেছে এবং জিহাদের ইবাদাত পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু অস্ত্র বা যুদ্ধ কোন ফিকির নয় এবং সেগুলো থেকে কখনো চিন্তাধারা ও মানহাজে পৌঁছা সম্ভব নয়।

মানহাজের মধ্যে কিছু বিশ্বাস ও কার্যক্রমের সমষ্টি থাকে যার মাধ্যমে ইহা অন্যান্য জামাত থেকে ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ কেহ যদি বলে, উনি ইখওয়ানের সদস্য;

---

[৬] অর্থাৎ এগুলো মূল উপাদান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়? মূল উপাদানের বিষয়টি এগুলো থেকে স্বতন্ত্র?

তখন মুহুর্তেই আপনার মাথায় এই ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, বোঝ-বুদ্ধি এবং তাদের কর্মপদ্ধতি ভেসে উঠবে। অথবা উনি হচ্ছেন জিহাদী, এই হচ্ছে শিয়া, এই হচ্ছে গণতান্ত্রিক ইত্যাদি।

এই হিসেবে আফগানিস্তানে এসে আমরা ভুলে সম্মুখীন হয়েছি, যাকে ভুল হিসেবে জানা আবশ্যক। আমরা এখানে যা প্রতিষ্ঠা করেছি তা হচ্ছে “মিলিশিয়া”। মিলিশিয়া হচ্ছে যে বাহিনীর সদস্যরা শুধু অস্ত্র ধারণ করে। অর্থাৎ তারা প্রশিক্ষণ নেয় ও বুলেট নিক্ষেপের জায়গায় গিয়ে কিছু বুলেট ফায়ার করে; এরপর যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনে গিয়ে একই কাজ করে আসে। এখানে আমি নিয়ত, প্রতিদান বা ছাওয়াব নিয়ে কথা বলছি না। এখানে আমি কথা বলছি সংগঠনের মূল উপাদান নিয়ে, যারা স্পষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করতে চায়।

সুতরাং চিন্তাধারা ও মানহাজ -যাকে পশ্চিমারা নাম দিয়েছে আইডোলজি- ইহাই কোন সংগঠনকে অন্য সমস্ত দল থেকে পৃথক করে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের আমির ও দায়িত্বশীলদেরকে চিহ্নিত করতে পারব।

যেমনটা আমি আপনাদেরকে বলেছি, আমরা এক সময় ইখওয়ানুল মুসলিমের সাথে ছিলাম। সেখানে আমরা নির্দিষ্ট ফিকির, লক্ষ্য ও জিহাদের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ তারা ইরাকি প্রশাসন ও মুরতাদ দলগুলোর সাথে জোট করার ইচ্ছা করল। এখন এই কাজটা সংগঠনের জন্য জায়েজ নাকি নাজায়েজ, হালাল নাকি হারাম তা কে নির্ধারণ করবে?

সুতরাং মানহাজের হচ্ছে এমন বিষয় যেখানে সকলেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুজবে যাতে সত্য থেকে মিথ্যা পৃথক হয়ে যায়। এই মানহাজের উপর আমরা শরীয়ত থেকে একটি নাম দিতে পারি, তা হল; (সিয়াসাতুশ শরিয়াহ)।

শুরু থেকে কেহ মানহাজকে (সিয়াসাতুশ শরিয়াহ) লিপিবদ্ধ করে নি, একমাত্র আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল কাদের ব্যতিত। তখন মিশরের অন্যান্য জিহাদি জামাত মানহাজ নিয়ে তেমন গুরুত্ব দেয় নি। উনি প্রায় পূর্ণতার কাছাকাছি একটি মানহাজ উপস্থাপন করেছেন, যেখানে নির্দিষ্ট করা যাবে, আমরা কারা ও আমরা কি চাই। তার এই মানহাজের মাধ্যমেই মানুষ এই বিষয়ে জানতে পারে ... যা ময়দানে অনেক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে জিহাদের প্রতি আগ্রহশীল অধিকাংশ ব্যক্তি ও দল তা থেকে উপকৃত হয় ও অনুসরণ করা শুরু করে। সিরিয়াতেও

আমরা সংগঠনের জন্য মানহাজ প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু অনেক জামাতের এখনও পর্যন্ত কোন মানহাজ নেই বা তারা কোন মানহাজের অনুসরণ করতে চায় না।

আমরা মানহাজ নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব এবং জিহাদি চিন্তাধারা ও মানহাজ নিয়ে আমার গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করব।

সংগঠনের দ্বিতীয় উপাদানঃ নেতৃত্ব

সংগঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছেঃ চিন্তাধারা ও মানহাজ, নেতৃত্ব, সম্পদ, পরিকল্পনাকারী এবং শ্রবন ও আনুগত্য। আমরা এখানে তৃতীয় উপাদান নিয়ে কথা বলবঃ

নেতৃত্বের সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে আমির। আমরা যখন বলি নেতৃত্ব তখন মানুষের বুদ্ধিতে স্বাভাবিক ভাবেই চলে যায় অমুক সংগঠনের নেতৃত্ব হচ্ছে অমুক। নেতৃত্বে তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিতঃ

- প্রথমতঃ আমির
- দ্বিতীয়তঃ আমীরের নেতৃত্বের মজলিস; অর্থাৎ এমন কিছু মূল ব্যক্তিত্ব যারা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে।
- তৃতীয়তঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি; যে শূরা আমিরকে নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তের দিকে পৌঁছে দিবে।

পূর্ব যুগে শুধু খলিফা অথবা রাজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা যেত, রাজাই সব সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহা অসম্ভব; বরং আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব সমস্ত বাদশাহ-খলিফাদের কিছু নিকটবর্তী ব্যক্তি ছিল। সেই নিকটবর্তীদের কেউ হয়তো পরামর্শদাতা, কেউ গবেষণাকারী, কেউ গনক ইত্যাদি হত। এদের দায়িত্ব ছিল, কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তার কারণগুলো বাদশাহর সামনে স্পষ্ট করা।

কিন্তু বর্তমানে সময়ের পরিবর্তনে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নেতৃত্তের কাজটা সাংগঠনিক কাজে পরিণত হয়েছে। ফলে কোন আমির কখনো স্পষ্ট সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যদি অর্থের দায়িত্বশীলের সাথে পরামর্শ না করে, যার কাছে সংগঠনের সমস্ত অর্থের স্পষ্ট জ্ঞান থাকবে। অথবা যদি সামরিক বিশেষজ্ঞের সাথে

পরামর্শ না করে, যার সামরিক বিষয়ে সমস্ত জ্ঞান থাকবে। কারণ প্রতিনিয়তই অস্ত্রের বিস্তৃতি ঘটেছে, টেকনোলজির বিস্তৃতি ঘটেছে; তেমনি ভাবে মানহাজ, চিন্তাধারা ও সংগঠন ... সব কার্যক্রম আগে চেয়ে কঠিন হয়ে গেছে।

আমরা যদি আল্লাহর নবী আলাইহিস সালামের সীরাত থেকে নেতৃত্বের বিষয়টা গ্রহণ করতে চাই; তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে ছিলেন বদরী সাহাবীরা, গাছের নীচে বাইআত গ্রহণকারীগণ, মুহাজির ও আনসার। যাদেরকে পরবর্তীতে আহলে হল ও আকদ বলা হত, তারাই ছিল আল্লাহর নবী আলাইহিস সালামের ঘনিষ্ঠ সহচর। তাদের সাথে পরামর্শ করতেন যদিও তিনি তা থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন, যা ছিল উম্মাহকে শিখানোর জন্য। কেননা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শ ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন; যদি সিদ্ধান্ত সঠিক হতো তাহলে তার ওপর চলতেন, আর যদি সিদ্ধান্ত ভুল হতো তাহলে ওহীর মাধ্যমে শোধরিয়ে দেয়া হতো। তা সত্ত্বেও আল্লাহর নবী আলাইহিস সালাম তা বাস্তবায়ন করেছেন।

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংখ্যায় কম হওয়াঃ

যারা ইতিহাস পাঠ করবে তারা সেখানে দেখতে পাবে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এবং ইতিবাচক সফলতার কারণ হচ্ছে সংখ্যায় কম হওয়া। যদি কোন নেতার সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা ২০০-৪০০ জন থাকে; তাহলে একসময় একজন পরামর্শ দিবে, অন্য সময় আরেকজন পরামর্শ দিবে। তখন সেই নেতৃত্ব কোন সঠিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে পারবে না বরং চিন্তাগুলো বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে এবং সেই নেতা কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না।

ইহার একটি উদাহরণ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সময়ে মিত্রবাহিনীর অবস্থা, যারা জার্মানির সাথে যুদ্ধ করছিল। যখন তারা হিটলারকে পরাজিত করার ইচ্ছা করল, তখন ফ্রান্সে সেনা অবতরণের সিদ্ধান্ত নিল। সেই সময় মিত্রবাহিনীর সামরিক নেতৃত্বে ছিল ৪০০ জেনারেল। এই ৪০০ জেনারেল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে একত্রিত হয়ে যুদ্ধের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করত। কিন্তু আমেরিকা থেকে যখন মিত্র বাহিনীর কমান্ডার এজেনহাউরকে সেনা অবতরণের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা জন্য পাঠানো হলো, তখন তার সামরিক পরামর্শ সভার সদস্য ছিল

মাত্র আটজন জেনারেল। সে তার এই আট জেনারেলের সাথে মিলে বিশ্বযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং সেই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় যার যুদ্ধকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

নেতৃত্ব আমিরের জন্যে নির্দিষ্ট, তবে আমিরের সাথে এক বা দুইজন থাকবে যারা সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করবে। সুতরাং নেতৃত্ব হচ্ছে আমির, আমিরের সহকারী এবং নেতৃত্বে সভার সদস্যবৃন্দ, যাদের মাধ্যমে আমিরের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পূর্ণতা লাভ করবে। আমিরের উপর আবশ্যক নেতৃত্ব সভার সদস্যদের দ্বারা সিদ্ধান্তের উপাদানগুলো পরিপূর্ণ করবে। অর্থাৎ তাদের মাঝে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা থাকবে, শরয়ী পরামর্শদাতা থাকবে, সামরিক পরামর্শদাতা, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিচালনাগত পরামর্শদাতা থাকবে।

এখন আমিরের যদি এই বিশেষ ব্যক্তিদের বাহিরেও কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তাহলে মজলিসে শুরা এবং অন্যান্য সদস্যদের কাছে যেতে পারবে এবং তাদের থেকে সেই বিশেষ তথ্যগুলো গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

শূরাঃ

নেতৃত্বে তৃতীয় উপাদান হচ্ছে শূরা অর্থাৎ আমির কিভাবে পরামর্শ নিবেন। অথবা কোন সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমির তার নেতৃত্বে সভার সদস্যদের থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরামর্শ নিবেন। সিয়াসাতুশ শরিয়াহর ক্ষেত্রে আমরা জানি এই বিষয়ে তিনটি মতামত রয়েছেঃ

প্রথম মত হচ্ছে, আমিরের জন্য শূরা মুস্তাহাব; অর্থাৎ যদি চায় তাহলে পরামর্শ করবে অথবা না চাইলে করবে না। অতঃপর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়। এটা হচ্ছে অধিকাংশ উলামাদের মতামত যেমনটা “উমদাহ” কিতাবে এসেছে, সেখানে লেখক এই মতের অনেকগুলো দলিল দিয়েছেন এবং ইবনে তাইমিয়া থেকে জমহুরের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে, কিছু সালাফদের মত যাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ইবনে আতিয়্যাহ। তিনি বলেছেন, "আমিরের জন্য শূরা আবশ্যক। যে আমির আহলে ইলেমদের সাথে পরামর্শ করবে না তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হবে"।[৭]

উনি ইহাকে আমিরের উপযুক্ততা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ মনে করেন। যখন আমির আলেমদের সাথে পরামর্শ করার থেকে বিরত থাকবে তখন তাকে অপসারিত করতে হবে। এই মতের বিশেষ কারণ ছিল ইবনে আতিয়্যাহর সময়ে শাসকরা মুজতাহিদ ছিলনা। অর্থাৎ খলিফারা চাই উমাইয়্যাহ হোক, আব্বাসী হোক বা অন্য কেহ; আলেম ছিলনা, মুজতাহিদ ছিলনা এবং উমর বিন আব্দুল আজীদের মত দুর্লভ ব্যক্তি ছাড়া ইজতিহাদের যোগ্যতা তাদের মাঝে ছিল না। তাই দ্বিতীয় মতের কথা হচ্ছে আমিরের জন্য শূরা ওয়াজিব, তবে তারা জুমহুরের সাথে শূরার সিদ্ধান্ত আমিরের জন্য আবশ্যক না হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

তৃতীয় মত হচ্ছে বেদাতি মত যা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈরি হয়েছে। এই মতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম কথা বলেছে রশিদ রিজা, আফগানি, মোহাম্মদ আব্দু ও পশ্চিমা চিন্তায় প্রভাবিত ব্যক্তিরা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমিরের জন্য শূরার আবশ্যক এবং শূরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও আবশ্যক; অর্থাৎ আমিরের জন্যে আবশ্যক অধিকাংশ মতকে গ্রহণ করে নেওয়া। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, এই মতটা ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত হয়ে গেছে। একমাত্র জিহাদি দলগুলো ছাড়া অন্য কেহ এই মতকে পরিত্যাগ করে নি। মুজাহিদরা প্রথম বা দ্বিতীয় মতকে গ্রহণ করেছে; তাদের মত হচ্ছে শূরা হয়ত মুস্তাহাব নয়ত আবশ্যক; তবে শূরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক নয়।

আমরা এখানে তৃতীয় মতের ব্যাপারে আলোচনা করব না, কেননা আমরা পূর্বের আলোচনায় গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেছি। আর এই মতটাই হচ্ছে ইসলামিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের পূর্নাংগ বাস্তবায়ন। এইজন্যই রাশিদ গান্নুশীর মত ব্যক্তিরা বলতঃ

"গণতন্ত্র হচ্ছে আমাদের হারানো সম্পদ, যা আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে"।

---

[৭] সূত্র

তার এই কথার ভিত্তি হচ্ছে, ইসলামে শূরা আবশ্যক এবং শুরার স্বিদ্ধান্ত আমিরের জন্য গ্রহণ করে নেওয়া ওয়াজিব। তাই পশ্চিমারা যখন পার্লামেন্ট উদ্ভাবন করল এবং সিদ্ধান্ত অধিকাংশের মতে হতে শুরু করল, তখন তারা বলল; এই নীতি তারা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে।

আমরা তৃতীয় মত নিয়ে কোন কথা বলবো না বরং এখানে জমহুর এবং ইবনে আতিয়্যাহর মতামত নিয়ে আলোচনা করব। আমি এখন যে কথাগুলো বলব তা গ্রহণের উপযুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

শূরার ক্ষেত্রে শাইখ আবু মুসআব সূরীর মতঃ

যদি আমরা জমহুরের মত ও ইবনে আতিয়্যাহর মাযহাবের মধ্যে সামঞ্জস্য করি; জমহুরের মত হচ্ছে শূরা মুস্তাহাব অর্থাৎ আমির যদি তা বাস্তবায়ন না করে তাহলে তিরষ্কৃত হবে না, দ্বিতীয় মত হচ্ছে শূরা ওয়াজিব। তবে আমার মত হচ্ছে -আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন- পূর্বে এমন মত রয়েছে তাই জমহুর এর বিপরীত হলেও সমস্যা নেই; বর্তমানে ইবনে আতিয়্যাহর মত অধিক উপযুক্ত ও আবশ্যক এবং সঠিকতার নিকটবর্তী। এর কারণ দুইটিঃ

- সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো জটিল হয়ে গেছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অনেক কঠিন হয়ে গেছে।
- বর্তমান আমীরগণ -উনাদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি- সংগঠনের নেতাদের মাঝে মুজতাহিদের গুনাগুন একত্রিত নয়। তবে যদি কোন সংগঠনের আমির মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে তার ক্ষেত্রে বলা যাবে, সে মানুষের মশওয়ারা থেকে অমুখাপেক্ষী। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, আমির যদি শরিয়াতের বিষয়ে মুজতাহিদ হন তাহলে তারা সাধারনত রাজনৈতিক কার্যক্রম চর্চা করে না যেমনটা পূর্বের খলিফারা অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। একই সাথে সামরিক, পরিচালনা বা অর্থনৈতিক বিষয় অভিজ্ঞ হওয়া তো অনেক দূরের ব্যপার।

ইবনে তাইমিয়া শুরাকে আবশ্যক নয় বলার পর এই দুই মতের মধ্যে একত্রিত করার পদ্ধতি আলোচনা করেছেনঃ

"কিন্তু ইহা সালেহীনদের পথ, নবীগণের সুন্নাহ এবং ইনসাফগার বাদশাহগনের কাজ। অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা মুস্তাহাব হলেও বাস্তবায়নের দৃষ্টিতে অনেক দলিল-প্রমাণ আছে, যা আমিরের জন্য অনেকটা আবশ্যকের নিকটবর্তি করে দেয়।[৮]

আমরা শরীয়তের অবস্থান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাস্তবতার অবস্থান থেকে বলব, আমিরের জন্য শুরা আবশ্যক।

তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দুই পক্ষের কথার সাথে একমত। আমিরের জন্য শুরার স্বিদ্ধান্ত আবশ্যক নয়। কারণ যদি আমিরের জন্য পরামর্শের অধিকাংশ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক হয়, তাহলে তার দায়িত্ব হবে শুধু রায় গননা করা। সবাইকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কি হ্যাঁ নাকি না; অর্থাৎ এর ফলে সে আমিরের দায়িত্ব হারিয়ে ফেলবে। এই পদ্ধতিটি শরিয়াহগত ভাবে প্রমাণিত নয় বরং শরীয়তের দলিল তার বিপরীত, ইহাকে পরিত্যাগ করে এবং সেই সাথে ইহা বাস্তবায়ন যোগ্য নয়।

অন্যদিকে আমরা জেনেছি এমন কিছু নেতা রয়েছে যারা কখনোই পরামর্শ করে না, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের কোন দলগত পদ্ধতি নেই; আমি ইহা ব্যর্থতার প্রথম কারণ হিসেবে উল্লেখ করব, আল্লাহ আ'লাম। কেননা চিন্তাধারা ও মানহাজ পূর্ণতার জন্য আমির ও নেতৃত্ব প্রয়োজন, আর এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যক্তি যারা ধাপে ধাপে সবকিছু বাস্তবায়ন করবে। একদিকে চিন্তাধারা ও মানহাজ অন্যদিকে নেতৃত্ব।

যেই দলের মানহাজ ও নেতৃত্ত নেই, সেটা সংগঠন নয় এবং তাদের পরিণতি ব্যর্থতাঃ

আমি বলি যে সংগঠনের মধ্যে মানহাজ নেই সেটা সংগঠনই নয় এবং তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে, যদি আল্লাহ তাআলা কোন মজিজা প্রকাশ না করেন। যে সমস্ত সংগঠনগুলো নির্দিষ্ট চিন্তাধারা ও মানহাজ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো ব্যর্থ হবে। আর যেগুলো বিচ্যুত বা সমস্যাযুক্ত মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো চলমান থাকবে। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলমিন। তাদের

---

[৮] ইবনে তাইমিয়াহর উদ্ধৃতি শেষ কোথায়? চিহ্ন দরকার। উদ্ধৃতির সূত্র দরকার।

চিন্তা ধারার মধ্যে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই জামাত চলমান রয়েছে। আপনি ইয়ামেন, আলজেরিয়া সহ দুনিয়ার সমস্ত ইখওয়ানীকে দেখতে পাবেন একই আচরণ করছে, একই কাজ করছে এবং একই ভ্রান্তিতে পতিত হচ্ছে। এমনকি তাদের নেতারাও একই ভুল সব জায়গায় করছে। আপনি সিরিয়াতে ইখওয়ানের নেতাদেরকে দেখবেন জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, জর্ডানে ইখওয়ানের নেতারা জিহাদের সর্বশেষ আহ্বান গুলোর সাথে লড়াই করেছে, শাইখ জানদানি হুবহু একই পদ্ধতিতে ইয়ামানে জিহাদের প্রত্যেকটি চেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এমনকি সুদানকে বর্তমানে যারা পরিচালনা করছে, একই পদ্ধতিতে জিহাদের বিরুদ্ধে দক্ষিন সুদানে অবস্থান নিচ্ছে; তারা যদিও ইখওয়ানী নয় কিন্তু একই আদর্শের সন্তান। তেমনি ভাবে তুরস্কে আরবাকানের দল এবং পাকিস্তানি জামাতে ইসলামী। তাই আমি বলি নির্দিষ্ট মানহাজ একই পথে হাঁটতে বাধ্য করে, তাদের মধ্যে যতই ভাগ থাকুক না কেন।

যে জামাতের জিহাদি মানহাজ রয়েছে তারা সর্বদা জিহাদের পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তাদের যতই আমির চলে যাক এবং অন্য আমির আসুক, এক মাজলিসে শূরা বিলুপ্ত হয়ে আরেকটি আসুক, মানুষ সর্বদা একই পদ্ধতিতে কাজের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এজন্যই আমরা স্পষ্ট ভাবে বলছি, যে জামাতের মানহাজ নেই সেটা জামাত নয়।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা জাতির পরিচয়ে বলেছেঃ প্রত্যেক জাতির মধ্যে তিনটি উপাদান থাকবে; ভূমি, জনগণ ও অবকাঠামো। অর্থাৎ মানুষের কোন জমায়াতের যদি ভূমি না থাকে তাহলে তারা জাতি নয়, যেমন বর্তমান ফিলিস্তিনিরা। ফিলিস্তিনিরা এমন একটি রাষ্ট্র নিয়ে এসেছে যার অস্তিত্ব শুধু কাগজেই, তারা এসে ইয়াসির আরাফাতকে বলল; আপনি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রধান। অন্যদিকে পশ্চিমা রাজনীতিকরা এই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করা কারণ হিসেবে বলেছে; তাদের কোন ভূমি নেই। এ রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র নয়, এরা কোন জাতি নয়। রেড ইন্ডিয়ানদের ভূমি আছে, জনগণ আছে কিন্তু তাদের মৌলিক কোন ক্ষমতা নেই। তাই ইতিহাসের কেহই এবং কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি তাদেরকে জাতি হিসেবে গণ্য করে নি; বরং তারা কিছু মানুষের সমষ্টি।

এই ধারাবাহিকতায় আমরা বলব কোন সংগঠন হওয়ার জন্য সংগঠনের জন্য উপকরণগুলো অস্তিত্ব আসা আবশ্যক। কোথাও যদি ৫০ জন মানুষ একত্রিত হয়ে

বলে আমরা অমুক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই; তারা কি জিহাদি জমায়েত নাকি সংগঠন? তারা শুধু কিছু মানুষের জমায়েত, এটা সংগঠন নয়। তাদের উপর সংগঠনের শব্দ প্রয়োগ করার আগে এর উপাদান গুলো পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে। তাই তারা কোথায় যুদ্ধ করছে, কিভাবে যুদ্ধ করছে, যুদ্ধটা কি সঠিক হচ্ছে নাকি ভুল? ইত্যাদি দেখা ব্যতিত আমরা বলব; যে সংগঠন মৌলিক উপাদানগুলো ব্যতীত যুদ্ধ করতে চায় তারা অবশ্যই ব্যর্থ একটি জমায়েত।

তাই আমরা বলেছি মানহাজ হচ্ছে মূল বিষয় যার থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে নেতৃত্ব; যদি কোন দলের মধ্যে নেতৃত্ব না থাকে তাহলে সেই দলের কখনোই সংগঠন হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় উপাদানঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

জিহাদি সংগঠনের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে সম্পদ, যা সমস্ত বিপদের বিপদ। ইসলামি কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলেই জানে, অর্থের সমস্যা সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। এর ফলেই সংগঠনগুলোকে বিক্রি করা হয়, ক্রয় করা হয়। অর্থের কারণে কোন দল বড় শক্তির গোলামী করে বা কাজের ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্যুত হয়। এখন আমরা যদি ইসলামী কার্যক্রমের সম্পদ অর্জনের উৎসগুলো মূল্যায়ন করি তাহলে সেগুলো কি?

জিহাদি আন্দোলন এর অর্থের উৎসঃ

১- ইসলামের বিরোধী পক্ষ বা ত্বাগুতী প্রশাসনঃ

অর্থের উৎস তিনটি, হয়তো প্রশাসন অথবা তাগুতি পক্ষসমূহ; সিরিয়ার জিহাদ কোনো এক পর্যায়ে ইরাকের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আফগান জিহাদ কোন এক পর্যায়ে তাগুতী উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিল যেমন সৌদি ও অন্যান্যরা। এই সমস্ত উৎসগুলোর আফগান জিহাদে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভালো কোন নিয়ত ছিল না। যার ফলে তাদের নিজস্ব স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে এক সময় দিত এবং আরেক সময় অর্থ দেয়া বন্ধ করে দিত; কারণ এরা হচ্ছে ইসলামের বিরোধী ত্বাগুতি প্রশাসন।

২- ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও জোটঃ

দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দলসমূহ। সমস্ত মানুষ আরবের প্রতি তাকিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে ভালো ব্যক্তিরা জিহাদি সংগঠনগুলোর প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। আপনাদের মধ্যে কেহ যখন কোন সংগঠন করার ইচ্ছা করে, তখন প্রথমেই তার মাথায় যে চিন্তা আসে তা হলঃ আমি কিছু ফিকির তৈরি করব এবং কিছু মানুষকে একত্রিত করব, অতঃপর আরবের জনগণের কাছে যাব। বর্তমানের সমস্ত ইসলামপন্থীরা এই পদ্ধতিতে চিন্তা করে।

৩- সংগঠনের সদস্যদের থেকে অর্থ সংগ্রহঃ

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে সংগঠনের সদস্যদের থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা। এই পদ্ধতিটা সফল একটি পদ্ধতি এবং অনেক কম মানুষ ইহা বাস্তবায়ন করেছে। এই পদ্ধতিটা শুধু সেই সংগঠন অনুসরণ করতে পারে যাদের কাছে অনেক সদস্য রয়েছে। অর্থাৎ কোন সংগঠনের যদি প্রকাশ্য সমাবেশ হয় অথবা তাদের মাদ্রাসা ও মসজিদ থাকে অথবা কোন সম্মেলনে ১০ বা ২০ হাজার মানুষকে একত্রিত হয়; তখনই সংগঠন বলতে পারবে, আমাদের প্রত্যেক সমর্থক এই সম্মেলনে আসার সময় অর্থ নিয়ে আসবে। ফলে তখন সে এই বিশাল সংখ্যক সদস্যদের থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে, এটা হচ্ছে অনেক পরিষ্কার এবং আদর্শ একটি উৎস।

৪- গনিমতঃ

চতুর্থ উৎস হিসেবে আমি যেটা বিশ্বাস করি তা এমন নতুন চিন্তা যার ব্যাপারে অনেক অল্প মানুষ কথা বলেছে; তা হল অর্থের জন্য জিহাদের উপর নির্ভর করা। যা (আমার রিজিক আমার বর্ষার ছায়া তলে) এই হাদিসের বাস্তবায়ন। বর্তমানে আমাদের চতুর্পাশে অনেক কাফের শক্তি ও যুদ্ধা শক্তি রয়েছে। চারপাশে এমন অনেক বাহিনী রয়েছে যাদের সম্পদ বৈধ। যেখানে আমরা মানুষের রক্ত হালাল করে নিয়েছি এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করছি, সেখানে সম্পদ তো অনেক স্বল্পমূল্যের। এখনো পর্যন্ত কোন সংগঠন এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে না। অন্যদিকে

আফসোসের সাথে বলতে হয়, জিহাদী সংগঠনগুলো আরবে গিয়ে তাদেরকে ডাকতে থাকে; "হে আরববাসী, আমরা যুদ্ধ করতে চাই তাই আমাদেরকে সাহায্য কর"।

এই পদ্ধতির উপর আমাদের আবার দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

পূর্বে বর্ণিত উৎস গুলোর মধ্যে শুধু দুইটা ধারাবাহিক অর্থের যোগান দিয়ে যাবে, তা হচ্ছে তৃতীয় এবং চতুর্থ মাধ্যম। এর কারণ হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ প্রশাসন বা তাগুতি পক্ষগুলোর উপর নির্ভর না করা আবশ্যক। অথচ এই বিষয়টা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যেমন "ফিলিস্তিনী স্বাধীনতা সংঘ" অসংখ্য জিহাদি সংগঠনকে সাহায্য করে থাকে, তেমনি ভাবে ইরান অনেক জিহাদী সংগঠনকে সাহায্য করে। তবে সর্বদাই এই কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত এবং পথভ্রষ্ট পক্ষগুলো নিজস্ব স্বার্থে সম্পদ দেয়, তাই আমরা সম্পদের জন্য তাদের উপর নির্ভর করতে পরামর্শ দেই না। কারণ তার মধ্যে মৌলিকভাবে কোন বরকত নেই।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিমদের মধ্যে ভালো ব্যক্তিরা সর্বদা বাধার সম্মুখীন হয়। এক সময় আরবের ভাল ব্যক্তিরা আফগান জিহাদে সাহায্য করত, ইসলামী দলগুলোকে সাহায্য করত, ফিলিস্তিনের আন্দোলনকে সাহায্য করত। কিন্তু যখন আরব উপসাগরীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় -যা ছিল সকলের ইচ্ছার বাহিরে- এই সমস্ত ভাল ব্যক্তিদেরকে সাহায্য থেকে বিরত থাকার জন্য বাধ্য করা হয়।

ভবিষ্যতের অনুধাবন থেকে বুঝা যায়, আমেরিকান ক্রুসেডারদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথেই এই উৎসটা বন্ধ হয়ে যাবে। নতুন জোট ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে কখনোই মুসলিমদের সম্পদ জিহাদিদের হাতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। তারা এই কাজটা খুব সহজেই করতে পারবে। কোন অঞ্চলে যদি ফতুয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে ওলামাদের কেন্দ্র রয়েছে, তাদের কাজ হবে সে সমস্ত কেন্দ্র থেকে যে কোন একজনকে বের করে এনে মানুষের সামনে দাঁড় করাবে। যে আলেম তাদেরকে বলবে; এখন আফগানে সম্পদ দান করা নাজায়েজ হয়ে গেছে। তখন অসংখ্য ব্যবসায়ীরা দান করা থেকে বিরত থাকবে।

অন্যদিকে গোয়েন্দারা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে দান করা থাকে বিরত রাখবে। তাদেরকে গোয়েন্দারা বলবেঃ আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন, তোমরা

আফগানে দান করতে চাচ্ছে। কিন্তু এ সমস্ত সম্পদগুলো তো সন্ত্রাসীদের কাছে যাচ্ছে।

সৌদি আরব প্রকাশ্যেই এমন একটি কার্যক্রম শুরু করেছে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেঃ যারা আফগানিস্থানে দান করতে চায় তাদের জন্য আমির সালমান বিন আব্দুল আজিজ একটি একাউন্ট খুলেছেন, যারা দান করতে চায় তারা যেন সেই একাউন্টে দান করে। ফলে সমস্ত মানুষ বাধ্য, যদি সে দান করতে চায় তাহলে এই মাধ্যমেই দান করতে হবে। এখন কোন ব্যক্তি যদি বোকা হয় তাহলে সে দান করবে। আর যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে বুঝবে এই সম্পদ কখনোই সঠিক স্থানে পৌঁছে না বরং গোপনে সব সম্পদ সরিয়ে নেওয়া হবে। এই সরিয়ে নেয়ার কাজটি প্রশাসন খুব গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করবে।

সুতরাং ভবিষ্যৎ ৫-১০ বছরের ভিতর সম্পদশালী দেশগুলো থেকে মুসলিম জনগণের সম্পদ আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত ধরে নেয়া হবে বিচক্ষণতার কাজ। অন্যদিকে যে সমস্ত রাষ্ট্রে অর্থ নেই, মুসলিমরা সেখান থেকে কোনো দান পাঠাতে পারবে না।

তাই এখন তৃতীয় এবং চতুর্থ উৎস বাকি রয়ে গেছে। তৃতীয় উৎস হচ্ছে সদস্যদের দান এবং সংগঠনের বিশেষ সংগ্রহ। তবে এক্ষেত্রে বড় কোন সংগঠন ছাড়া সম্পদ অর্জন করতে পারবে না। এবং চতুর্থ উৎস হচ্ছে; যার ব্যাপারে প্রত্যেকটা সংগঠন আলাদা ভাবে চিন্তা করা আবশ্যক, কিভাবে তারা অস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের অর্থের যোগান দিবে।

পাপাচারী নেতা ও মুসলিমদের সম্পদ অপচয়কারী ব্যবসায়ীদের মাল গনিমত হওয়ার ব্যাপারে শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জামের ফতাওয়াঃ

আমি আব্দুল্লাহ আজ্জাম ছাড়া অন্য কারও সূত্র দিতে পারব না। এবং এই কথাগুলো আমি উল্লেখ করছি শুধু ইলমের প্রচারের জন্য, বিষয় যত বড় হোক। আমি একদিন শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জামকে সেই সমস্ত আমির, ব্যবসায়ী ও পাপাচারী আরবদের সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি যারা ইউরোপে এসে মুসলিমদের সম্পদগুলোকে তাদের পাপাচারে নষ্ট করে, তখন তিনি বললেনঃ "এই সম্পদ শক্তি ও কঠোরতার মাধ্যমে গ্রহণ করা বৈধ"।

এই কথাটা আমি আমার নিজ জিম্মাদারীতে প্রকাশ করছি। তখন আমি বললাম; যদি এই কাজের এমন শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় যাতে যা রক্ত প্রবাহিত করবে; যার সম্পদ নিতে গিয়েছেন সে আপনাকে দেখে পলিয়ে গিয়ে আপনার ব্যপারে প্রচার শুরু করবে।

তিনি বললেনঃ "আমি সেই মুসলিমকে হত্যা বৈধতা দেই না যে সম্পদ অপচয় করে, তবে যদি হত্যা ছাড়া সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হও তাহলে তা গ্রহন করা জায়েজ"।

তাই বুদ্ধিমত্বার সাথে এই পদ্ধতি নিয়েও চিন্তা করা আবশ্যক।

আমি অপর এক আলেমকে জিজ্ঞাস করেছি -যিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম থেকে ফিকাহ ও ওজনে কম নন, যেহেতু জিবিত তাই নাম নিচ্ছি না - তিনিও আমাকে একই কথা বলেছেন। এক জিহাদী সংগঠনের আমীর যিনি আলেম তাকেও জিজ্ঞাস করেছি, তিনিও আমাকে একই কথা বলেছেন। সেই সাথে এই তিনজনই বলেছেনঃ

এই অবস্থায় হত্যা করা বৈধ নয়। কেননা তারা হচ্ছে বোকা মুসলিম যারা মুসলিমদের সম্পর্কে অপচয় করছে।

তবে এই ব্যক্তিদের রক্ত যদি অন্য কোন কারণে হালাল হয়ে থাকে, যেমন তারা কাফের বা মুরতাদ অথবা তাগুত প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত; তাহলে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার কাজ কয়েকগুণ বেশি বৈধতা পাবে। কারণ তখন আপনি সম্পদ অর্জনের সাথে কাফেরকে হত্যা করছেন।

কিডন্যাপ করার ক্ষেত্রে শিয়াদের অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করুন, আমি এই সমস্ত ব্যক্তি বা তারা কিভাবে অর্থ উপার্জন করেছে তা নিয়ে কথা বলতে চাই না। কিন্তু সেদিকে স্বল্প দৃষ্টি দিলে যায় জিহাদি সংগঠনকে আবারো নিজেদের সম্পদের ব্যাপারে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।[৯]

অর্থের স্থির উৎসের সংগঠনের সম্পদকে বিনিয়োগ করা:

---

[৯] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আচরণবিধির আলোকে টিকা যুক্ত করতে হবে

বর্তমান সংগঠনগুলোর সম্পদের উৎস হচ্ছে দানকারী মুসলিমগণ, প্রশাসন বা সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। যদি কোন জামাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ জমা হয় তাহলে বিশেষ কাজ হল; ব্যবসায়ীক কাজে সম্পদগুলো বিনিয়োগ করা। অর্থাৎ প্রত্যেকটা সংগঠনের রাজনৈতিক এবং সামরিক শাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ী শাখা থাকবে। যেই ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সামরিক ও রাজনৈতিক শাখা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হবে।

অর্থাৎ আপনি ব্যবসায়ী শাখাকে বলবেন আমাদের কাছে ৫ লক্ষ ডলার সমমূল্যের সম্পদ রয়েছে; তুমি সুদান, তুরস্ক, জার্মান বা অন্য কোন দেশে গিয়ে এই সম্পদ বিনিয়োগ কর। এই ক্ষেত্রে কখনোই এমন ব্যক্তিকে পাঠাব না যাদের সামরিক বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে অথবা যাকে খোঁজা হচ্ছে। অবশ্যই এই ক্ষেত্র অন্যান্য শাখার কাজের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না। কারণ যদি এমন কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয় যার সামরিক কোন কাজ রয়েছে, ফলে যদি তাকে শেষ করে দেয়া হয় বা গ্রেফতার করা হয় তখন পুরো সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অর্থনৈতিক শাখাটি সামরিক ও রাজনৈতিক কাজ থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হবে। যে শাখার কাজ হবে শুধু অর্থ বিনিয়োগ করে বৃদ্ধি করা।

ব্যবসায়িক বিনিয়োগে বর্তমান স্বাভাবিক লাভ হচ্ছে মূলধনের ২৫%। অর্থাৎ যদি আপনি ১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেন তখন বাৎসরিক লাভ হবে এক মিলিয়ন ডলারের ২৫%। তাই আপনি আপনার সংগঠনের ব্যয় অনুযায়ী সেই সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারবেন। যদি আপনার সাংগঠনের বাৎসরিক ব্যয় হয় অর্ধ মিলিয়ন ডলার, তাহলে কতটুকু মূলধন অর্জন করলে আপনি নিজেই নিজের সেই প্রয়োজনীয়তার পূরণ করতে পারবেন? তখন আপনার কাছে বিনিয়োগের জন্য দুই মিলিয়ন ডলার থাকতে হবে। এই মূলধনের সাথে সামরিক ও সাংগঠনিক কাজের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই দুই মিলিয়ন ডলারের কাজ হবে আপনার সংগঠনের জন্য প্রতি বছর অর্ধ মিলিয়ন ডলার লাভ নিয়ে আসা।

অর্থের উৎস নষ্ট হওয়া ও অর্থ দ্বারা কাবু করার কৌশলঃ

সিরিয়ার জিহাদ, আফগান জিহাদ সহ সমস্ত জিহাদি কার্যক্রম যে সমস্যায় পতিত হয়েছে; যা আমি এখন পর্যন্ত শুনেছি তা হলঃ

সংগঠনগুলো সবার থেকে অর্থ গ্রহণ করে -এই অংশটা খুব ভালো করে বুঝুন- অতঃপর সেই সংগঠনগুলো বর্তমান আয়ের উপর ভিত্তি করে কাজকে প্রসারিত করে। অর্থাৎ আমি এখন জিহাদে ব্যস্ত রয়েছি, এখন আমার কাছে কোন ভাল বা খারাপ বা শিয়া বা পাকিস্তানি অথবা অন্য যে কেউ এসে বলল; তোমরা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আমার কাছে এক মিলিয়ন ডলার আছে যা আমি তোমাদেরকে দিতে চাই। তখন সেই সংগঠন সম্পদ গ্রহণ করে নিজেদেরকে প্রসারিত করে ফেলে; ১০ জন সদস্য থাকলে ১০০০ বৃদ্ধি করে, দশটি গাড়ি জায়গায় ১০০ টি গাড়ি কিনে, পূর্বে যদি দুইটি কামান থাকে তখন চারটি কিনে, নতুন এক হাজার পিস্তল কিনে; অর্থাৎ সংগঠনটি এক মিলিয়ন ডলার মূলধনের উপর ভিত্তি করে নিজেকে প্রসারিত করে এবং এক মাসেই এক লক্ষ ডলার খরচ করে ফেলে।

কিছুদিন পর সম্পদ শেষ হয়ে যায় এবং তারা আরো সম্পদের মুখাপেক্ষী হয়; তখন দানকারী এসে তাদেরকে বলে, ঠিক আছে আরো নিন। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার দান করে। অতঃপর যখন এই সম্পদ প্রদানকারী – ইসলামী বা অনৈসলামিক, ভালো বা মন্দ যেই হোক- যখন নিশ্চিত হয় এই সংগঠনের জীবন এই অর্থের উপর নির্ভরশীল তখন নিজস্ব চাহিদা ব্যক্ত করে। তখন আপনাকে বলবে; অমুক অবস্থানটা গ্রহণ করুন, অমুক কাজটি সম্পাদন করুন। প্রথম দিকে আপনার মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হবে, ফলে আপনি বলবেন এমন কাজ করবো না। তখন তারা আপনাকে এক মিলিয়ন দেওয়ার পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ দিবে অথবা দেরি করবে যাতে আপনি তাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করেন।

সিরিয়ার জিহাদে সম্পদ নষ্ট হওয়ার অভিজ্ঞতাঃ

সিরিয়ার জিহাদে এই কৌশলটি আমাদের ওপর বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অতঃপর ইখওয়ান তা বাস্তবায়ন করেছে ত্বালিয়া[১০] সংগঠনের উপর, সর্বশেষ আল্লাহ তায়ালা ইরাকি প্রশাসনকে পাঠিয়েছেন যারা ইখওয়ানের ওপর তা বাস্তবায়ন করে।

---

[১০] আত্ব-তালিয়াহ আল মুক্বাতিলা – নামের তানজীম যার নেতা ছিলেন আদনান উক্বলা। সংক্ষিপ্ত টীকা যুক্ত করা প্রয়োজন।

যখন সিরিয়াতে জিহাদ শুরু হয়, তখন জর্ডানে অবস্থিত ইখওয়ানুল মুসলিমিন কোন শর্ত ছাড়াই সিরিয়ার জিহাদের নেতাদেরকে সম্পদ দেয়। যখন ইখওয়ানের নেতৃত্ব -যারা ইসলামী দল জেহাদের ভালো চায়- নিশ্চিত হয় সিরিয়ার জিহাদ সেই সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, তখন তাদের নেতৃত্ব থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠায় যার নাম আবু আনাস আলী আল-বায়ানুনী। সে এসে সিরিয়ার নেতাদের বলল; তোমরা আমাদের অনুগত হবে এবং অবশ্যই সীমান্তের অপর পাশের নেতাদের আদেশ মানতে হবে। কিন্তু তারা অনুগত হতে অস্বীকৃতি জানায় ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে তারা সাহায্য করা বন্ধ করে দেয়।

সাহায্য একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি তখন হালাবে ছিলাম। তখন ১০, ১৫ বা ৫০ জন মুজাহিদ এসে বলতো; তাদের কাছে খাবার কিনার টাকাও নেই। প্রত্যেকে নিজ অস্ত্র বহন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাচ্ছে, কিন্তু আশ্রয় ও খাবার নেই। এই কথাগুলো নিশ্চিত প্রমানিত। যার আপনাদেরকে তখন যারা এই কাজগুলো করেছে তাদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে না বরং বর্তমানে জীবিত ইখওয়ানের ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তখন কি হয়েছিল?!

তারা এই পরিকল্পনা করেছিল যাতে জিহাদের নেতৃত্ব তাদের সামনে আত্বসমর্পণ করে। এর মূল পরিকল্পনাকারী ছিলঃ

- সাইদ হাওয়ী
- আদনান সা'দুদ্বীন
- আলী বায়ানুনী[১১]
- আরেকজন ব্যক্তি যায় নাম আব্দুল্লাহ (...)

এরাই পরিকল্পনা করে মুজাহিদদের উপর কৌশল বাস্তবায়ন করেছে। অতঃপর ইরাকি প্রশাসন একই কৌশল তাদের উপরই বাস্তবায়ন করেছে। তাদেরকে বলেছেঃ

"হে ইখওয়ান, তোমরা কি চাও?"

---

[১১] এই তিনজনের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত টিকা

তারা বললঃ “আমরা অস্ত্র চাই, সীমানা চাই, সম্পদ চাই এবং এই জিনিসগুলো চাই”।

তখন ইরাকের প্রশাসন তাদের সব ইচ্ছা পূরণ করে। ফলে তারা সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের কাজ বৃদ্ধি করে। একটা সময় যখন সিরিয়া ভূমধ্যসাগর এবং ইরাকের মধ্যবর্তী তেলের পাইপ লাইন বন্ধ করে দেয়, তখন ইরাকী প্রশাসন ইখওয়ানের অপারেশন রুমে আদেশ পাঠায় যাতে তেলের পাইপ লাইনে অপারেশন চালায়। তখন কিছু সদস্য গিয়ে সেখানে আক্রমণ পরিচালনা করে এবং জিহাদের উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরবর্তী ঘৃণ্য কাজে নিহত হয়। তারা সেখানে তেলের পাইপের উপর বোমা নিক্ষেপ করে যা ছিল ইরাকের স্বার্থে। ফলে তখন তাদেরকে ইরাক যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেছে, তাদের ইচ্ছামত অবস্থান নিয়েছে এবং তাদের ইচ্ছামত কার্যক্রম করেছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধে সিরিয়ার ইখওয়ানের কি অবস্থা হয়েছে তা আপনারা দেখেছেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যে সমস্ত পক্ষগুলো তাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে -সৌদি- তারা ইখওয়ানের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহকে সৌদির পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। এই ব্যক্তি -আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ- তার সাথে থাকার অভিজ্ঞতার ফলে আমি তাকে পছন্দ করিনা। কিন্তু আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, এ ব্যক্তি যা প্রকাশ করেছে তা বলতে চায় নি, কিন্তু সেই ছিল বাধ্য। সে বলেছেঃ

সৌদি হচ্ছে তাওহিদের রাষ্ট্র ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীতে বলেছে আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে বলেছে, সেই দেশে আমাদের ১৭০০ পরিবার রয়েছে, যদি সৌদী তাদেরকে বের করে দেয় তাহলে তাদের নিয়ে আমরা কোথায় যাব?[১২]

তাই হে ভাইয়রা, তোমার সতর্ক হওয়া; কেননা তোমরা এমন এক বিশ্বে আছ যেখানের এক ইঞ্চি জায়গা তোমাদের পক্ষে নয়। আমরা যখন কোন একটি অঞ্চলের যাব, তখন গবেষণা করতে হবে কিভাবে শত্রু চিন্তা করে এবং কিভাবে পদক্ষেপ নেয়। এই সমস্ত ব্যক্তিরা যখন আমাদেরকে সাহায্য করে তখন অবশ্যই

---

[১২] সংবেদনশীল বিষয় বাংলাদেশে। সৌদি হচ্ছে তাওহিদের রাষ্ট্র – এ ব্যাপারে তাঁর মূল বক্তব্য, উদ্ধৃতি খুঁজে বের করে সংযুক্ত করতে হবে/সূত্র দিতে হবে।

তারা আমাদের থেকে তাদের স্বার্থের অবস্থান আশা করবে। তখন যেমন ইখওয়ান বাধ্য হয়েছিল যাদের মূলে ছিল শাইখ আবদুল ফাত্তাহ, তিনি হাদিসের ইমাম হয়েও ভ্রান্ত ফতোয়া দিতে বাধ্য হয়েছেন।

অর্থ বৃদ্ধি ও ভারসাম্যতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পার্টির অভিজ্ঞতাঃ

যদি আপনার কাছে এমন কোন উৎস থেকে অর্থ আসে যেগুলোর ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি -আমি ভালো উৎস কথা বলেছি এবং খারাপ উৎসগুলো থেকে সতর্ক করেছি- তাহলে সেগুলো সরাসরি খরচ না করে বিনিয়োগ করা আবশ্যক। চিন্তা করুন, যদি আফগানরা তাদের কাছে আসা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের এক অংশ বিনিয়োগ করত; যদি তারা নিজেদের ভূমিকে বিনির্মাণ করতে অথবা মুহাজিরদের কাজে লাগিয়ে দিত; সেখানে ছয় মিলিয়ন মুহাজিদের কর্মঠ হাত ছিল। যদি এই সম্পদের অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ অথবা ১০ ভাগের এক ভাগও বিনিয়োগ করা হতো, এমনকি যদি তা সামরিক পদ্ধতিতেই হোক; তাহলে তারা এখন অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকত না বরং তারা আজ নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন হত।

আমি এখানে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগঠনের (PLO) উদাহরণ দিচ্ছি, যারা ৬ মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করেছিল, যে বিষয়টা সকলেই জানে। কিন্তু অপ্রকাশ্য বিষয় হচ্ছে, এই সম্পদ ইউরোপের ক্যাসিনো ও অশ্লীলতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছিল। কারণ জুয়া, পতিতালয় ও অশ্লিলতার ব্যবসা দ্রুত লাভ নিয়ে আসে। যদি আপনি আজ কোন পতিতালয় খুলেন তাহলে দ্বিতীয় দিন থেকে লাভ আসতে থাকবে, ঠিক তেমনি ভাবে ক্যাসিনো ও জুয়া খেলা। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে, যেখানে তাদের নির্দিষ্ট শাখা ও দায়িত্বশীল ছিল।

তারা এই সম্পদ গুলো আরবের শাসকদের থেকে ছিনিয়ে আনত। তারা সেগুলোকে ব্যবহার না করে বরং বিনিয়োগ করে বৃদ্ধি করত। তাই বর্তমানে ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংগঠন হামাসকে কিনে নিয়েছে। হামাসকে কিনে নেওয়া ও ফিলিস্তিনী ন্যাশনাল কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করার মাধ্যম ছিল, ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগঠন (PLO) ফিলিস্তিনের সমস্ত আন্দোলনে অর্থ যোগান

দিত, যা ছিল অনেক প্রকাশ্য বিষয়। এমনকি হামাসের নেতারা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগঠনের বিরোধী হওয়া সত্বেও তাদের থেকে বেতন গ্রহণ করত।

সেখানে ইসলামিক একটি উৎস ছিল যা আসত কুয়েত থেকে। কুয়েত দ্রুত সাহায্য শুরু করার কারণ ছিল যাতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে অর্থ নেয়ার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ফিলিস্তিনী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল অর্থ জোগানদাতা হচ্ছে স্বাধীনতা সংগঠন (PLO); তাই বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করুন।

যে সংগঠনের অর্থের নিশ্চিত উৎস নেই এবং সেই উৎসকে বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নেই; তারা কোন অর্থনৈতিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে না। অর্থনীতি প্রকল্পের জন্য তিনটে উপাদান যেটা আমরা পূর্বেই বলেছিঃ

- অর্থের উৎস
- অর্থকে বিনিয়োগ করার পদ্ধতি
- অর্থকে ব্যয় করার ভারসাম্যতা

আপনি জানেন আপনার কাছে অর্ধ মিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ডলার বা ১০ হাজার ডলার বা ১ হাজার ডলার আছে। এখন সেই পরিমান সাংগঠনিক প্রসারতা ও কাজ করবেন যতটুকুর বাস্তব সামর্থ রয়েছে, যাতে এক সময় তা বন্ধ না হয়ে যায়। কারণ এটা সত্য যে, মানুষ আপনাকে মৃত্যুর উপর বায়াত দিয়েছে এবং শ্রবণ ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু মানুষ যখন ক্ষুধার্ত হবে, তার স্ত্রীকে ক্ষুধার্ত পাবে এবং সন্তানদেরকে ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করতে দেখবে; তখন ইচ্ছা থাকলেও সঠিক ভাবে চিন্তা করতে পারবে না। সঠিকভাবে যুদ্ধ করতে পারবে। তখন সে তার সংকল্পে পুনরায় দৃষ্টি বুলাবে। আপনাকে বলবেঃ “আপনি আমাকে রক্ষা করছেন না, আমি যুদ্ধ করার আগে খেতে চাই”।

তাই অর্থনীতি প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই তিনটা বিষয়কে বাস্তবায়ন করতে হবে। উৎস তৈরির পাশাপাশি সেগুলো বিনিয়োগ করা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষা করা।

ইহা হচ্ছে সংগঠনের তৃতীয় উপাদান, তবে সম্পদ ছাড়াও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। এই উপাদানটি মৌলিক উপাদান নয় বরং মৌলিক উপাদান হচ্ছে মানহাজ

ও নেতৃত্ব। মানহাজ এবং নেতৃত্ব ছাড়া কোন সংগঠন হওয়া সম্ভব নয়। আর যে সংগঠনের সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেই সেটা সংগঠন হতে পারবে কিন্তু ধ্বংস অনিবার্য। যে সমস্ত সংগঠনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও প্রকল্প নেই তাদের ধ্বংসের পরিমাণ হচ্ছে ৯৯%।

চতুর্থ উপাদানঃ সামগ্রিক পরিকল্পনা

সংগঠনের চতুর্থ উপাদান হচ্ছে, পরিকল্পনা থাকা। কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা থাকা। আপনি মানুষ থেকে কি চান? কেন মানুষকে একত্রিত করেছেন ও কেন সংঘটিত করেছে? ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রত্যেকেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা চায়; কিন্তু আপনি কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন?

আপনি যদি কোন গাড়ি নির্মান করতে চান, তখন কাষ্টমার এসে আপনাকে বলবে, এটি রেইসের জন্যে তৈরি করুন; তখন আপনি তার উপযুক্ত পদ্ধতিতে নির্মান করবেন। কিন্তু গাড়ির উদ্দেশ্য যদি হয়, ১ হাজার কেজি আলু বহন করা তাহলে আপনার কাছে দ্রুততা গুরুত্বপুর্ণ থাকবে না বরং চেষ্টা করবেন গাড়ির জায়গা যাতে হাজার কেজি ধারনের উপযুক্ত হয়।

যদি আপনার কাছে এমন সংগঠন থাকে যাদের উদ্দেশ্য দাওয়াতী কাজ করা; তাহলে তাদেরকে প্রকাশ্য পদ্ধতিতে গঠন করবেন। যাতে তারা মসজিদে প্রবেশ করে, এবং আপনি একটি পরিকল্পনা তৈরি করবেন, যেখানে কিছু বছরের ভিতর প্রত্যেকটা গ্রামের প্রতিটা মসজিদে আপনি একজন করে দায়ী দিতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন। তখন আপনার কাছে আনসার তৈরি হবে, যার ভিত্তিতে আপনি গোপন কার্যক্রম শুরু করবেন। কিছু বিশেষ ব্যক্তি তাদের দ্বারা বাহিনী তৈরি করবেন ... এই হচ্ছে পরিকল্পনা।

যদি সংগঠনের নেতৃত্ব শুরু থেকেই না জানে তারা কি চায়, তাহলে কিভাবে মানুষকে একত্রিত করবে বা সংগঠিত করবে!

এই পরিকল্পনাকে সামরিক পরিভাষা স্ট্র্যাটেজি বলা হয়। স্ট্রাটেজি হচ্ছেঃ এমন কিছু দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সমষ্টি যা পরিবর্তন যোগ্য নয়। রাজনীতিক ও স্ট্রেটেজিক বিশেষজ্ঞরা বলেনঃ কোনো সিদ্ধান্ত যদি ছয় মাসের ভিতরে পরিবর্তন করা হয় তাহলে তা স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত নয়।

ধরুন, আমাদের সংগঠন পরিকল্পনা হল জালালাবাদ পর্যন্ত বিজয় করা, কিন্তু কিছু দিন পর আফগান যুদ্ধই ত্যাগ করে পরিকল্পনা করলাম, আমাদের বাহিনী নিয়ে অমুক দেশে যাব, কিছুদিন পর বললাম; না, আমরা সবাই ইয়ামানে যাব ... এই বিক্ষিপ্ত পথগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে এদের কোন পরিকল্পনা নেই।

আপনারা অনেকেই ছোট ছোট দলে রয়েছেন, যারা প্রাথমিক কাজে রয়েছেন বা কাজ করতে চাচ্ছেন। আপনার দলকে সংগঠনে রূপ দেওয়ার জন্য এটা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক, আপনারা কি চান? সংগঠনের লক্ষ্য কি? এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের উপযুক্ত গঠন পদ্ধতি কি?

ধরুন, আমি আফ্রিকাতে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রতিরোধে জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করব। যার জন্য কিছু সদস্য বাছাই করে সেখানে নিয়ে যাব এবং এই এই কাজ করব। তাই প্রথমে এই কাজের পরিকল্পনা করা এবং প্রতিপক্ষের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা অবশ্যক। তখন আমি বলব, আমি অমুক স্থানে কার্যক্রম শুরু করব ফলে প্রতিপক্ষ এই ধরনের কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তারা এই কাজ করে তাহলে আমি সেই কাজ করব। পরিকল্পনাকারীর সফলতা পরিমাপ করা হয় - যেমনটা দাবা খেলার মধ্যে- তার চিন্তা দূরত্ব কতটুকু তার ওপর। কিছু খেলোয়ার সামনের ৬ ধাপ চিন্তা করতে পারে, আবার কিছু খেলোয়ার ৯ ধাপ চিন্তা করতে পারে। আপনি ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে জোটবদ্ধ প্রশাসনের সাথে খুব ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠেছেন, যারা বিভিন্ন ইসলামিক দল ও উলামাদের দ্বারা সুরক্ষিত। অন্যদিকে আপনি এমন এক জাতির মধ্যে আছেন যাদের সাথে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ আপনার সর্বোত্তম অবস্থাতেও জনগণ অন্তর দিয়ে আপনার সাথে থাকলেও বাস্তব যুদ্ধে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমি এক সময় মিশরীয় জনগণের কাছে জিহাদের খবর জিজ্ঞেস করতাম এবং মিশরের বিদ্যমান দলগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতাম। আফসোসের বিষয় হচ্ছে, ১শ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে মাত্র ৩, ৪ বা ১০ পাবেন যারা মুজাহিদদের লক্ষ্য কি তা জানে। সিরিয়ার ৫০ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে কয় মিলিয়ন মানুষের সাথে যুদ্ধের সম্পর্ক রয়েছে? এত কঠিন পরিবেশেও আপনি পরিকল্পনা ছাড়া কাজ করতে চান?

কাজের সফল মৌলিক বিষয় হচ্ছে পরিকল্পনা। একটি সংগঠনের যদি মানহাজ এবং নেতৃত্ব থাকে তাহলে মাসে মাত্র দেড়শ ডলার খরচ করেও চলমান থাকতে

পারে। কিন্তু কতক্ষণ চলবে?! লক্ষ্যে পৌছাতে না পারার কারণে কতজন সদস্য রাস্তায় ঝরে পড়বে?!

সংগঠনের পঞ্চম উপাদান হচ্ছেঃ সামরিকতা বা শ্রবণ ও আনুগত্য

আমরা মানহাজ নিয়ে কথা বলেছি অতঃপর নেতৃত্ব অতঃপর সম্পদ অতঃপর পরিকল্পনা। এখন আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি অংশ বাকি রয়েছে তা হলো শ্রবণ ও আনুগত্য যাকে সামরিকতা বলা হয়।[১৩]

মানহাজ, নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক প্রকল্প, সামগ্রিক পরিকল্পনা এসব নেতৃত্বের কাজ। এগুলো যারা নেতা হবে তাদের দায়িত্ব। কিন্তু অন্যান্য সদস্যদের থেকে কি চাওয়া?

সদস্যদের থেকে একমাত্র চাওয়া হচ্ছে শ্রবণ ও আনুগত্য -সামরিকতা- অর্থাৎ তার কাছে যখন কোনো আদেশ আসবে তখন সেটা ভালোভাবে বুঝবে ও বাস্তবায়ন করবে। তার কাছে পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে যে, তার নেতৃত্ব কখনোই তাকে শরিয়তের বাহিরে আদেশ দিবেনা। এমনকি কখনো যদি কোন অস্পষ্ট বিষয়ে আদেশ দেন তখন তার সামনে দলিল উপস্থাপন করবে, ফলে দলিল স্পষ্ট হওয়ার পর সে তা বাস্তবায়ন করবে এবং কখনোই অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না।

যেমনটা প্রশাসনিক বাহিনীতে বলা হয় (তুমি আদেশ পরিপূর্ণ পালন করো কোন দ্বিধা বা অভিযোগ করা ব্যতীত)। প্রত্যেকটা প্রশাসনিক বাহিনীতে এটাই নিয়ম, (আগে বাস্তবায়ন করো অতঃপর প্রশ্ন করো)। অনেক আফসোসের সাথে বলতে হয়, এই ধরনের শ্রবণ ও আনুগত্যের মানসিকতা -বাস্তবতা যতই তিক্ত হোক- জিহাদি সংগঠনগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ উপস্থিত নয়। আমি এখন পর্যন্ত যাদেরকেই দেখেছি, তারা শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইআত দেয় প্রাচুর্যতা ও তৃপ্তির সময়ের জন্য; ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, কঠিন-সহজ এবং প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়। তারা শুধু শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়াত দেবে ইচ্ছায় এবং তৃপ্তির সময়ের জন্য। যখন আপনি তাকে এমন কোনো দায়িত্ব দিবেন যা তার কাছে প্রিয় নয়, তখন সে কষ্ট পাবে।

---

[১৩] এখানে মূল আরবীতে কী শব্দ ব্যবহার হয়েছে? এখানে কি Chain of Command –উদ্দেশ্য? সামরিকতা শব্দটি শাব্দিকভাবে মিলছে না মনে হচ্ছে।

আর যদি সেই দায়িত্বটা তার চাহিদার অনুযায়ী হয় তখন সাথে সাথে বাস্তবায়ন করবে। আরবের সমস্ত ভাইরা সাহসী এবং মুমিন -মাশাল্লাহ্ বারাকাল্লাহ্ ফীহিম- যদি আপনি তাদের বলেন যুদ্ধে যাও -যার জন্য সে প্রচন্ড আগ্রহী ও ইচ্ছুক- তখন সে দ্রুত যাবে। কিন্তু যদি আপনি তাকে বলেন, রান্না করা বা পাহারাদারি করা অথবা এমন কোন অপছন্দনীয় কাজের আদেশ দেন; তখন সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসবে। অবস্থা এতটাই নাজুক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, আপনি যদি কোন সদস্যের ব্যাপারে সন্দেহ করেন সে হয়তো গোয়েন্দা। এখন আপনি এসে আহমাদ, আলী ও যায়েদকে আদেশ দিলেন যাতে তারা সংগঠনের সদস্য 'সাইদ'কে গুম করে ফেলে। তারা বিনা প্রশ্নে তা বাস্তবায়ন করবে না বরং তাদেরকে সেই আদেশটির সকল বিষয় বুঝাতে হবে ও সকল গোপন তথ্য প্রকাশ করতে হবে। বর্তমানে এমন কোন সংগঠন নেই যারা আনুগত্যের বিষয়টাকে খুব গুরুত্বের সাথে আঁকড়ে ধরেছে।

এখন আমরা প্রশিক্ষণের স্তরে রয়েছি যেখানে সাধারনত মানহাজের ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত থাকে। এখানে আপনি যদি বলেন; হে ভাইয়েরা, শাসককে তাকফীর করো। অমুক কাজটি বাস্তবায়ন করো বা অমুক অঞ্চল যাও। তারা বলবে আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। কিন্তু যখনই তাদেরকে খুব কঠিন কোন কাজ দেয়া হবে যার ব্যাপারে তারা আশ্বস্ত নয়, তখন সেটা বাস্তবায়ন করবে না।

আমি সর্বশেষ কিছু কথা বলতে চাই, যা হয়তো নেতাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করবেনা। আমি বলবঃ

সংগঠনের উপকরণগুলো সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য পরিমাণ পূর্ণতা ব্যতীত কোন নেতার জন্য মানুষের কাছ থেকে শ্রবণ ও আনুগত্য চাওয়া শরীয়ত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

অর্থাৎ যে সংগঠনের চিন্তাধারা ও মানহাজ নেই, যারা এখনো পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারেনি যে, শাসক কাফের নাকি কাফের নয়; শাসকের সাহায্যকারীকে হত্যা করা হবে নাকি হবে না। যারা এখনো পর্যন্ত এই বিষয়গুলো নির্ধারণ করে নি, তারা কিভাবে তাদের সদস্যদের থেকে এমন আদেশের বাস্তবায়ন চাইতে পারে যা এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত অথচ এখনও তা নির্ধারণ করেনি? কিভাবে কমান্ডার তার সদস্য থেকে বিরক্ত হতে পারে যদি তার আদেশ বাস্তবায়ন না করে?

যেই সংগঠনের নেতৃত্ব নেই বা নেতা মারা যায় তাহলে আমরা তাদের জন্য অন্য নেতা নিয়ে আসবো। কিন্তু সেখানে যদি পূর্ব থেকেই কোন নেতৃত্ব না থাকে তাহলে কিভাবে মানুষকে পরবর্তী নেতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করব! আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যাওয়ার সময় বলে গেছেন; "আমার উপরে আমির হবে উমর" বিষয়টা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে এবং সকলেই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে কি কোন সংগঠন তার সদস্যদেরকে আশ্বস্ত করতে পারবে যখন তার আমির মারা যাওয়ার সময় বলে যাবে, আমার পর অমুক হবে আমির তাকে গ্রহণ করে নাও?!

উমাইয়া খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক মারা যাওয়ার সময় একটা কাগজের মধ্যে পরবর্তী খলিফার নাম "ওমর ইবনে আবদুল আযীয' লিখলেন এবং তার উজীরদের শর্ত দিলেন, যাতে তারা এই কাগজের ভিতরের নামের ব্যক্তিকে না জেনেই বায়আত দেন। তখন তারা পূর্বের আমিরের কথা মেনে নেয় এবং নতুন খলিফাকে গ্রহণ করে নেয়। যদিও উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন -ইহা আলোচ্য বিষয় নয়- আলোচ্য বিষয় হচ্ছেঃ যদি পূর্বে আমির না থাকে তাহলে মানুষ কিভাবে তাদের পরবর্তি নেতাকে গ্রহন করবে?

তৃতীয় উপাদানের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, যার কাছে অর্থনৈতিক প্রকল্প নেই ও যারা মানুষকে খাওয়াতে পারে না; সাধারণ বুদ্ধিতে চিন্তা করলেও বুঝা যায়, তার জন্য মানুষের কাছে এমন আনুগত্য আশা করা উচিত না যা তার ভবিষ্যৎকে কষ্টকর করে তুলবে এবং আদেশ বাস্তবায়নের পরবর্তী সময়ে জীবন যাপনের ব্যয়ভার বহনের কোন কিছুই তার কাছে থাকবে না।

সংগঠনের চতুর্থ উপাদানের ব্যাপারে, যা এক কাজ থেকে আরেক কাজে ঘুরতে থাকে, এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্ট এবং এক আন্দোলন থেকে আরেক আন্দোলনে দৌড়াতে থাকে; কিভাবে মানুষকে তার সাথে চলার জন্য আশ্বস্ত করবে অথচ মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করবে, "হে ভাই আপনি কি করছেন? আপনার পরিকল্পনা কি বা আপনি কি চান?

আমি শরীয়তের অবস্থান থেকে বলব, কোন জামাতের জন্য মানুষের কাছ থেকে বায়আত নেওয়া এবং তাদের শ্রবণ ও আনুগত্যের আবশ্যকীয়তার জন্য সর্বনিম্ন শর্ত হচ্ছে, একটি শরিয়াসম্মত মানহাজ প্রকাশ করা। তারা তখন মানুষকে বলবে

আমরা এই মানহাজে আপনাদেরকে পরিচালিত করব। কিন্তু তারা যদি কোন মানহাজ দেখাতে না পারে তাহলে তাদের জন্য কোন শ্রবণ বা আনুগত্য থাকবে না। কেননা মানুষ কখনো খরকুটার মানহাজ অনুসরণ করে না, যেখানে হালাল এবং হারাম স্পষ্ট নয়।

তেমনি ভাবে সেই সংগঠনের শ্রবণ ও আনুগত্য গ্রহণ করা হবে না, যাদের কাছে নেতৃত্ব নেই, সম্পদ নেই বা স্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। এখন আমরা সংগঠনের প্রথম উপাদান ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহ।

মানহাজ

এখন আমরা মানহাজের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, এটা সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; কেননা যে সংগঠন সমস্যাযুক্ত মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং সেটা খারাপ ফলাফল ব্যতীত অন্য কোথাও পৌছবে না। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা পাপাচারীদের কাজকে কখনই সফল করেন না।

আমার কাছে যে গবেষণাটি রয়েছে সেটা শরয়ী সিয়াসতের মানহাজের নমুনা হিসেবে কিছু ভাইকে দিয়েছিলাম। এই গবেষণাটি করেছিলাম যাতে আমি এবং কিছু ভাই উপকৃত হতে পারি এবং এমন কিছু দল ও সংগঠনকে দিতে পারে যারা এখনো মানহাজ উপস্থাপন করতে পারে নি।

মিশরের জামাতুল জিহাদের[১৪] বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর এই গবেষণাটি করেছি এবং ছাপিয়েছি –আলোচনা-পর্যালোচনার জন্যে-। জামাতুল জিহাদ হচ্ছে সেই জামায়াত গুলোর মধ্যে একটি যারা শরয়ী সিয়াসতের মানহাজকে খুব ভালোভাবে পরিপূর্ণ করেছে।

---

[১৪] শায়খ আইমানের জামাআহ। কিছুটা বিস্তারিত টীকা যুক্ত করতে হবে।

তেমনি ভাবে মিশরের জামায়াতুল ইসলামিয়া[১৫], যারা তাদের মানহাজ "মিসাকুল আমালিল ইসলামী"[১৬] কিতাবের মধ্যে সংক্ষেপে আলোচনা করছে। তারা সেখানে মানহাজের উত্তম নমুনা পেশ করেছেন। তেমনি সিরিয়ার ডাইরির[১৭] মধ্যে মানহাজের আলোচনা আছে, যাতে শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সমস্যা নেই বা সিয়াসাতুশ শরিয়াহর দৃষ্টিতেও সমস্যা নেই। এটা ছিল সিরিয়ার মুজাহিদ ভাইদের মানহাজ যাকে তারা পরবর্তী আরো উন্নতি করেছিল। তেমনি ভাবে আমি আরো অনেক মানহাজের ব্যাপারে জেনেছি, যার মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদ সুরুর বা সুরুরিয়্যাহ জামাত। এছাড়া আরও অনেক ছোট-বড় জামাত।

আমরা যে সমস্ত জিহাদী জামাতের মধ্যে কিছু সামষ্টিক বিষয় রয়েছে; যেমন তারা সবাই সশস্ত্র কার্যক্রমের দাবিদার এবং ইসলামী শাসন ফিরে আনতে হিংস্রতা ব্যবহারে সন্তুষ্ট। তেমনি ভাবে আমি মানহাজের নমুনা হিসেবে যে মূল উপাদানগুলো চয়ন করেছি তার মধ্যেই কিছু সামষ্টিক বিষয় রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়গুলোকে উপস্থাপনের পূর্বে কিছু আলেমদের কাছে পেশ করা হয়েছে, কেননা শরীয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ে আলেমদের কাছে যাচাই ব্যতিত গ্রহন করার দুঃসাহস আমি দেখাতে পারি না। অনেক পরিবর্তন হয়ে সর্বশেষ বর্তমান অবস্থানে এসে পৌঁছেছে, যেটা আমি খুব দ্রুত আপনাদের সামনে পাঠ করবো। যদি এখানে কোন মন্তব্য থাকে তাহলে তা উপস্থাপন করব।

আলোচনার শিরোনাম হচ্ছে (শরয়ী সিয়াসতের মানহাজের মূলনীতি ও মৌলিক বিষয় সমূহ - লেখক মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ)

ইসলামী আন্দোলনগুলো এখনো তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার কারণঃ

আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি কেন ইসলামী জামায়াতগুলো এখনো শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। অনেক জামায়াত আছে যেগুলোর প্রতিষ্ঠার ৭০

---

[১৫] শায়খ উমার আব্দুর রাহমানের জামাআহ। কিছুটা বিস্তারিত টীকা যুক্ত করতে হবে

[১৬] এ কিতাবের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ আছে। In pursuit of Allah's pleasure/আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে

[১৭] এটি কি শায়খ আবু মুসআবের লিখিত কোন কিতাবের নাম? তাহলে মূল আরবী নাম যুক্ত করতে হবে। এবং লিঙ্ক।

বছর পার হয়ে গেছে, যেমন ইখওয়ানুল মুসলিম ও তার সাদৃশ্য দলগুলো। এখানে অনেক জিহাদী জামাত আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠার ১৫ থেকে ২০ বছর হয়ে গেছে। এই সময়টা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। কেননা অনেক দেশ বিশ্বযুদ্ধের ফলে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ২০ থেকে ২৫ বছরের ভিতর আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত শুরু থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মাত্র কয়েক বছর সময় লেগেছে। কিন্তু আমরা কেন হোঁচট খাচ্ছি? কোন সন্দেহ নাই আল্লাহ তায়ালা কখন জয়ী হব ও কখন পরাজিত হবে তা লিখে রেখেছেন, তাকদীরের বিষয়টি আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আসবাবের জগতে কেন এখনও আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি?

আমার মত হচ্ছে, আমি ইসলামী জামাতগুলো -জিহাদী হোক বা অজিহাদী- চারটি গর্তের যেকোনো একটিতে পতিত হয়েছে, যা তাদের ফলাফলে না পৌঁছার মূল কারণ ছিলঃ

প্রথম কারণঃ মানহাজ বিনষ্টতা

প্রথম ও মূল সমস্যা হচ্ছে, ইসলামের সঠিক মানহাজ থেকে দূরে থাকা এবং কিতাব ও সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ না করা। স্বার্থ, বুদ্ধির চাহিদা এবং নেতাদের স্বার্থের মানসিকতাকে ইসলামী শরিয়ার নীতিমালার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ ইসলাম আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করার পর নিজেদের চাহিদা ও স্বার্থের অনুসরণ করা এবং সেটাকেই তাদের মূলনীতি বানিয়ে ফেলা।

আমি এই ধারার অনেক বড়দের সাথে সাক্ষাত করেছি ও কথা বলেছি। এক নেতা আমাকে বলছিল "প্রথমে স্বার্থ অতঃপর শরীয়ত" অর্থাৎ তার চাহিদা অনুযায়ী শরিয়ত হবে। এখন সে যদি পার্লামেন্টে নিজের স্বার্থ দেখতে পায় বা ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বের মধ্যে স্বার্থ খুঁজে পায় অথবা অন্য কোন বিষয়ে স্বার্থ খুজে পায়; তাহলে এটা বৈধ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

এই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ইখওয়ান, যারা এই পদ্ধতিতে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, এই ব্যক্তিরা কখনোই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি ও পারবে না। আমাদের কাছে কিতাব-সুন্নাহ থেকে দলিল আছে, তারা কখনোই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। যদি কখনো তাদের কোন ধরনের

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয় যেমনটা সুদান ও সুদানের বাইরে হয়েছে; তাহলে সেটা একেবারেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তখন এই ব্যক্তিরা হয়তো তাদের কাজ থেকে ফিরে আসবে এবং ইসলামের সঠিক মানহাজকে প্রতিষ্ঠা করবে অথবা তাদেরকে কয়েক বছরের ভিতর ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এমনকি আলজেরিয়ান ভাইয়েরা যখন বিজয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল এবং শহরগুলো উৎসবে প্লাবিত করছিল, তখন আমরা বলেছিঃ অবশ্যই এদের পতন হবে। তখন কেহই এই ধরনের কথা শুনতে চাইত না। আমরা তাদেরকে বলতামঃ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পাপাচারীদের কাজকে ইসলাহ করেন না) অতঃপর বাস্তবেই একটা সময় তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হয়েছে এবং তাদেরকে বিচ্যুত করা হয়। এটা ছিল আল-জাজায়েরের জনগণের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যাতে অহংকারীদের ধ্বংস তাড়াতাড়ি দেন।

দ্বিতীয় কারণঃ বাস্তবতা না বুঝা

লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সমসাময়িক বাস্তবতা বুঝতে না পারা। অর্থাৎ এই প্রকারের ব্যক্তিরা প্রথম গর্ত থেকে বেঁচে গিয়েছে এবং কিতাব-সুন্নাহকে আকড়ে ধরেছে। কিন্তু তারা দ্বিতীয় গর্তে পতিত হয়েছে; তা হল সমসাময়িক বাস্তবতা এবং দাওয়াহ ও তার অনুসাংগিক পরিবেশ বোঝা থেকে দূরে থাকে। সেই সাথে শুধু শরিয়তের মানহাজ ও দলিলের অনুসরণ নিয়ে ব্যস্ত থাকা, যার ফলে তারা বাস্তবতা থেকে দূরে শরিয়াহর মূলনীতির মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকে। এই সমস্যায় অনেক ইলমি ধারার ব্যক্তিরা পতিত হয়েছে। অর্থাৎ অনেক উলামা ও দায়ীদের জামাত এতে পতিত হয়েছে। তেমনি ভাবে যে সমস্ত উলামারা কোন জামাতের সাথে নেই তাদের অধিকাংশ এই গর্তে নিপতিত হয়েছে; তা হল কুরআন-সুন্নাহর নসের সাথে সমসাময়িক বাস্তবতার সাথে মিল না থাকা।

শরিয়াতের দলীলকে বাস্তবতার সাথে না বুঝার কারণে তারা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি বরং চরম ব্যর্থ ফলাফলে পৌঁছেছে। যেমনটা জামইয়্যাহ তুরাস[১৮] ইরাকি প্রশাসন ও কাফের শাসকদের ফাঁদে পড়েছে। যেমনি ভাবে শায়খ আলবানী

[১৮] সংক্ষিপ্ত টীকা

তার কিছু ফতুয়ায় এ ধরনের বিপদে পড়েছে, যেমনটা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই ব্যক্তিরা এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যেগুলো তাদের সত্য পথে পৌছার বাধা হিসেবে গণ্য করা হয়। এর মূল কারণ হচ্ছে তারা শরীয়তের দলিল গুলোকে সমসাময়িক বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে বুঝার চেষ্টা করিনি, ফলে তারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি।

তৃতীয় কারণঃ জিহাদ থেকে বসে থাকা

তৃতীয় জামাত হচ্ছে, যারা কিতাব-সুন্নাহকে আকড়ে ধরেছে এবং সমসাময়িক বাস্তবতার ব্যাপারে তাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে। এর পরেও তারা তৃতীয় গর্তে পতিত হয়েছে, যা হল বাস্তব জিহাদ থেকে বসে থাকা। অর্থাৎ তারা বুঝে কিন্তু যা বুঝেছে তা বাস্তবায়ন করে না এবং যা বুঝেছে তা বাস্তবায়নের ইচ্ছাও রাখে না। ফলে তারা বাস্তব জিহাদ থেকে বসে থাকা, ত্যাগ-কুরবানী থেকে দূরে থাকার গর্তে পতিত হয়েছে। তারা দীর্ঘ মেয়াদি ঘাঁটি তৈরি করার দাবিতে বসে থাকার কৌশল গ্রহণ করেছে, যদিও কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী শরীয়তের মানহাজ এবং বাস্তবতার বুঝ তাদের কাছে অনেক বিশাল পরিমাণে রয়েছে।

এমন বসে থাকার মানসিকতা অনেক কম দলের রয়েছে, অর্থাৎ অনেক কম দলই আছে যারা শরীয়তের সঠিক বুজ ও সেটা সমসাময়িক বাস্তবতার সাথে সংযুক্ত করা সত্বেও জিহাদ করতে চায়না। আমি মানহাজী হিসেবে প্রত্যেককে তার নামে নামকরণ করি ও স্পষ্টতার জন্যে উদাহারণ দেইঃ

সুরুরীদের মানহাজ এবং মুহাম্মাদ সুরুরের সাথে শাইখ আবু মুসআবের সাক্ষাতঃ

যে জামাতে আমি এই নমুনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন দেখেছি তা হচ্ছে মুহাম্মাদ সুরুরের[১৯] জামাত। যখন আমি জর্ডানে ছিলাম তখন এই জামাতের সাথে আমার সরাসরি সম্পর্ক ছিল। অতঃপর সিরিয়াতে জিহাদের ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে একত্রে কাজ করেছি। এক সময় সরাসরি সুরুরের সাথে আমি সাক্ষাৎ করি এবং

---

[১৯] কিছুটা বিস্তারিত টীকা। ব্যক্তি ও তার জামাআতের ব্যাপারে

তার সাথে এই বিষয় নিয়ে অনেক বিতর্ক ও আলোচনা করি। আমি আপনাদের সামনে এসে আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি।

আমি জামাতে সুরুরের মানহাজে অনেক মুগ্ধ এবং তা শাইখ সুরুরকে সাক্ষাতে বলেছিঃ আমি চাই যেই যুবকদের আমি নির্দেশনা দেয়া তারা যাতে জামাতে সুরুরের প্রকাশনাগুলো আত্বস্ত করে। অর্থাৎ জামাতে সুরুরের প্রকাশনা গ্রহন করা হবে, দরস দেয়া হবে ও তার থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। তবে আপনারা কখনো তা বাস্তবায়ন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন না অথবা তাদের কথার উপর ভিত্তি করে কোন কাজ করতে পারবেন না। আমি এর কারণ ব্যাখ্যা করব।

আমি মোহাম্মাদ সুরুরের সাথে ৬ ঘণ্টা আলোচনা করেছি, এখানে শুধু স্পষ্ট হওয়ার জন্য কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করব। আমি আশা করব সেই দলের প্রতি মুগ্ধ ব্যক্তিদের অন্তর যাতে আমার কথায় সংকির্ণ না হয়। তবে বাস্তবেই তারা অনেক ভালোভাবে কুরআন এবং সুন্নাহর আঁকড়ে ধরেছে এবং বাস্তবতা বুঝতে পেরেছে, যা তাদের প্রকাশিত ম্যাগাজিনগুলো থেকেই স্পষ্ট।

শাইখ সুরুরের সাথে আমার আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে আমরা সকল বিষয়ে একমত হয়েছিলাম তবে তিনটা বিষয় ব্যতীতঃ

প্রথমতঃ তারা শাসকদেরকে নির্দিষ্ট তাকফির করে না। আমি ওনার সাথে ৬ ঘণ্টা আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত হোসনি মোবারকের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছি। কিন্তু যখনই আমি আরব শাসক এবং তাদের মত ব্যক্তিদের পর্যন্ত পৌছালাম তখন তিনি একেবারে পরিপূর্ণ অস্বীকার করে বসলেন এবং বললেন; সেখানে দলগত তাকফীর এবং নির্দিষ্ট তাকফীরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তিনি কাউকেই নির্দিষ্ট চাকরি করতে চান না। আমি বলি; যে শাসককে তাকফির করতে চায় না সে যেন নিজের উপর উপহাস করে, যদি সে কোন দল প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা বায়আত নিতে চায়। কেননা শাসক কাফের না হওয়ার অর্থ হচ্ছে তারা মুসলিম ও জালেম। যদি বিষয়টা এমনই হয় তাহলে তারা শরিয়াতের বৈধ শাসক, ফলে তার বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো বায়আত গ্রহণ করা বা দল প্রতিষ্ঠা করা জায়েজ নয়। সে যদি হাজ্জাজের মত বা তার থেকে নিকৃষ্ট মুসলিম হয়, তাহলেও কিসের ভিত্তিতে আমরা দল প্রতিষ্ঠা করব? মুসলিম শাসকের উপস্থিতিতে দল প্রতিষ্ঠার ফল হচ্ছে হাদিসের ভাষ্যমতেই তাদের ঘাড়ে আঘাত করা আবশ্যক। অর্থাৎ সব জামাতের আমীর গর্দান ফেলে দেওয়া আবশ্যক, এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট।

দ্বিতীয়তঃ ইহা তার থেকেও ভয়াবহ। তার মত হচ্ছে, দলগত মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না যতক্ষন পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন মুসলিম থাকবে, এটা তাদের কাছে প্রসিদ্ধ একটি ফতোয়া। তারা বলে, কিভাবে আপনি এমন মানুষের সাথে যুদ্ধ করবেন যাদের মধ্যে মুসলমান রয়েছে? গোয়েন্দা বাহিনীর মধ্যে মুসলিম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, সামরিক বাহিনীর মধ্যে অবশ্যই মুসলিম আছে; তাহলে কিভাবে আপনি মানুষকে এই বিপদে ফেলে দিচ্ছেন?

আমি তাদেরকে বললামঃ মানুষ এটাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করছে এবং আমাদেরকে বন্দি করছে ও আমাদের সম্মান লুণ্ঠন করছে।

তিনি বললেনঃ আমরা কখনোই ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করতে পারবোনা যতক্ষণ না এই মাসআলা মানুষের কাছে একেবারে স্পষ্ট হয় এমনকি সাধারণ জনগণ, মহিলা ও অক্ষমদের কাছেও জানা থাকবে। প্রত্যেকটা মানুষের কাছে তাগুতের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টা স্পষ্ট থাকতে হবে, তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ হবে। অর্থাৎ তারা দলগত মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জায়েজ বলে না।

তৃতীয়তঃ সাংগঠনিক পূর্ণতা পর্যন্ত জিহাদ জায়েজ নয়।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এ কথাটি সত্য। স্ট্রেটেজিক পরিকল্পনা হিসেবে তা আবশ্যক। তবে সে বলছেঃ কোন জামাত স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক শাখা ব্যতিত যুদ্ধে স্তরেই প্রবেশ করতে পারবে না। মিডিয়া শাখায় পত্রিকা-ম্যাগাজিন থাকতে হবে। সামরিক শাখা, মানহাজের শাখা ইত্যাদি সবকিছু পূর্ন থাকবে ... এক কথায় একটি রাষ্ট্র। অর্থাৎ জিহাদ শুরুর জন্য তাদের পরিকল্পনা একটি বাস্তব রাষ্ট্র গঠন।

আমি তাকে বললামঃ হে শাইখ, এ কথাগুলো অনেক সুন্দর। কিন্তু আপনি যদি কোন রাষ্ট্রের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন এই নিতি বাস্তবায়নের অনুপযুক্ত। আমাকে পুরা বিশ্বের ৫ সে.মি. জায়গা দেখান যেটাকে আমি ব্যবহার করতে পারব এবং এমন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারব যাতে কোনো ভয় থাকবে না। সেখানে আমি মিডিয়া সংস্থা খুলে সব বিষয়ে কথা বলব কিন্তু গ্রেফতারের শিকার হব না।

আমি তাকে আরও বললাম, সাদ্দাম হুসাইন এর ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েই আপনি অনেকটা সংকোচ বোধ করছেন, কিন্তু যদি আমি বাদশা ফাহাদের ব্যাপারে আপনার সংস্থা থেকে পাঁচ মিনিট কথা বলি তাহলে সেটার কি হবে? আমরা যদি মিশরে বা মরোক্কোতে অথবা অন্য কোন দেশে যাই, আমরা কি এই বিষয়গুলো পরিপূর্ণ করতে পারব?

তিনি বললেনঃ যদি পূর্ণ করতে না পারি তাহলে আমরা জিহাদ শুরু করব না।

আমি তাকে বললামঃ কিন্তু আমরা শুরু করব এবং একসময় তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, আমরা যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু গ্রহণ করব যাতে একসময় বাকিটা পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের মত যুবকরাই সমস্ত বিপদ এর মূল। তোমরাই দাওয়াতের পরিবেশকে নষ্ট করেছ এবং তোমরা এই সমস্ত কাজ করেছো। আমি যুবকদের বিরুদ্ধে এবং যুবকদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আমার সাথে কাজের জন্য শর্ত হচ্ছে নেতৃত্বের মধ্যে একজন যুবকও থাকতে পারবে না।

এটা হচ্ছে আমার সাথে ওনার প্রথম সাক্ষাৎ।

তারপর সমস্ত কথা আমি পেশোয়ারে প্রচার করলাম। তখন এখানে সারুরী জামাতের কিছু ব্যক্তি শাইখের কাছে এই তথ্য পৌঁছায় যে, আমি তার মতামত এখানে প্রচার করছি। ফলে তিনি অনেক অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন; আমি উনার কথাগুলো ভুল বুঝেছি। আল্লাহর ইচ্ছায় কয়েক মাস পর আবার তার সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং একই বিষয় নিয়ে কথা বলি। আমি তাকে বললামঃ হে শাইখ, আপনার কথা অনুযায়ী আমি ভুল বুঝেছি, তাই আমি আমার ভুল শুধরাতে এসেছি। আমি অন্য শহর থেকে ৫০০ কিলো পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, আমার আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ভুলগুলো শুধরে নেওয়া।

তখন আমরা মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বলি, আমি উনাকে বললামঃ আমি আপনার কাছ থেকে তিনটা বিষয় শুধরাতে এসেছি যা আপনার থেকে বুঝেছি; শাসককে তাকফীর, দলগত মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সংগঠন পূর্ণতা।

প্রথমেই তিনি জবাব দিলেন: তোমার চিন্তা শুদ্ধ করা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং আমার থেকে তোমার সঠিক জিনিস গ্রহণ করাও গুরুত্বপূর্ণ নয়, মৌলিকভাবে তুমিই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নও।

আমি বললামঃ ঠিক আছে ভালো, এখানে এসেছিলাম আমার বোঝকে সঠিক করে নিতে। এখন আমাকে যদি আপনার কাছে কোন কিছুই মনে না হয় তাহলে আমি অন্য রুমে আমার স্ত্রীর সাথে সময় কাটাই, সেটাই আমার জন্য উত্তম হবে।

তখন তিনি বললেনঃ তুমি বের হওয়ার আগে এই বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব তোমাকে বুঝাতে চাই।

আমি বললামঃ ঠিক আছে। অর্থাৎ তিনি এখানে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র হিসেবে কথা বলছেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলামঃ

প্রথম মাসআলায় আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতামত কি; শাসককে তাকফির করা?

আমাকে বললেনঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হচ্ছে তারা আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন ত্যাগকারী প্রশাসনকে তাকফীর করে। কিন্তু স্বয়ং শাসককে তাকফীর করার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহর দুইটা মাযহাবঃ প্রথম মাযহাব তারা শাসককে কাফের বলে, দ্বিতীয় মাযহাব তারা তাকে অজ্ঞতার উজর দেয়।

আশ্চর্য! আমি মানুষকে শুনেছি শাসককে তাকফীর না করতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ শাসককে অজ্ঞতার উজর শুনি নি। কেননা শাসক হওয়ার শর্ত হচ্ছে জ্ঞানী হওয়া। আমি তাকে বললাম; এই বিষয়ে আমি আপনার সাথে বিতর্ক করবো না, কিন্তু আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি তা হল, এই দুই মতের মধ্যে আপনার নির্বাচন কোনটা?

তখন বললেনঃ "হে ভাই, এটা তো গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ!" মূল কথা হচ্ছে আমাদের সাক্ষাৎ বিতর্ক এবং কঠিন কথার মাধ্যমে শেষ হয়।

আমি সংক্ষেপে বলছি, এই দলের মানহাজ শুদ্ধ ও শরীয়তের অনুসরণকারী এবং বাস্তবতাও তারা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, তারা জিহাদ করতে চায় না। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যাতে তিনি মুসলিমদের সমস্ত জামাতকে পরিশুদ্ধ করে দেন। এটা হচ্ছে এমন জামায়াতের নমুনা যারা বাস্তবতার বুঝ এবং মানহাজ পূর্ণ করেছে, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব বাস্তব জিহাদ প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম।

সৌদি আরবের শাইখ সফর আল হাওয়ালির[২০] ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছে। যখন তিনি হকের চার ভাগের তিন ভাগ প্রকাশ করেছেন অতঃপর রাস্তা থেকে কেটে পড়েছেন। তিনি ছিলেন সুরুরী জামায়াতের আলেমদের একজন। যে ব্যক্তি এত হক কথা বলেছে, পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তার কি অভাব ছিল?

যার শরীয়তের এত বোঝ রয়েছে, বাস্তবতার এত বোঝ রয়েছে; সেই কথাগুলো বিদ্যমান শাসকের উপর প্রয়োগ করতে তাদের কিসের বাধা? এরপর আমাদের কাছে এসে চারটি শব্দ বলবে "রাষ্ট্র দখলকৃত, প্রশাসন কাফের ও জিহাদ আবশ্যক"। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের আলোচনার সাথে এই কথার কি ভিন্ন কোনো ফলাফল আছে? কিন্তু এখানে এসেই তারা থেমে যায় এবং রাস্তা থেকে কেটে পড়ে। যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই মানহাজের অনুসরণ করে তারা কখনোই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, এটাই হচ্ছে নিশ্চিত কথা। আমরা এই উদাহরণ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি কেননা এই উদাহরণটি ছিল স্পষ্ট, বিষয়টি ছিল বাস্তব এবং আল্লাহর সামনে আমি এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারব ও যে ইচ্ছা তার সাথে আলোচনা করতে পারব। আমি বাস্তবেই সেই ব্যক্তিকে বুঝতে চেয়েছিলাম, সর্বশেষ এই বিষয়ে সারসংক্ষেপ এমনটাই পেয়েছি।

চতুর্থ কারণঃ পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকা

চতুর্থ স্তর নিয়ে আলোচনা করব যারা হচ্ছে আমরা। আমরা নিজেদেরকে জিহাদী জামাত হিসেবে গণ্য করি কিন্তু কার্যক্রমের মাধ্যমে এখনো কাংক্ষিত ফলাফলে পৌঁছাতে পারি নি। আমরা সালাফদের মানহাজ বুঝেছি, বাস্তবায়ন করেছি, কাজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং বিশ্বাস করেছি। শেষ পর্যন্ত জিহাদ বাস্তবায়নের স্তরে পৌছেছি।

এমন কিছু জামাত আছে যাদের মানহাজ শরিয়াহ অনুযায়ী এবং তারা তা বাস্তব জিহাদের ময়দানে তা প্রয়োগ করেছে, কিন্তু সত্যিকারের প্রস্তুতি ব্যতীত। সত্য কথা হচ্ছে আমরা এখনো আবশ্যকীয় পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি এবং আসবাবের জগতে প্রস্তুতি ছাড়াই ময়দানে নেমে গেছি। সম্ভবত আমরা ভালো নিয়ত, ইখলাস,

---

[২০] ব্যক্তি এবং সৌদির সাহওয়াহ আন্দোলন নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত টিকা।

ঈমান এবং ভাল আখলাককে মূল হিসেবে গণ্য করি। কিন্তু প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা আমার সংগঠনের মূল উপাদানের আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

ভাইয়েরা, আমরা যদি নিজেদের সমালোচনা না করি তাহলে কখনোই আমরা আমাদের ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পারবোনা। আমরা অন্যদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সমালোচনা করেছি এবং বিস্তারিত বর্ণনা করেছি যে তারা সবাই ভুলের মধ্যে আছে। সর্বশেষ বলেছি আমরাই পরিপূর্ণ সঠিক মানহাজের অধিকারী। কিন্তু আমাদের বাস্তবায়ন সঠিক হচ্ছে না। আমরা জিহাদের সাথে এমন পদ্ধতিতে আচরণ করছি যা বেদুইনদের পদ্ধতি থেকেও খারাপ।

আমাদের মানহাজ এখনো অপূর্ণাঙ্গ। সম্ভবত জিহাদী দলগুলো মানহাজের শরয়ী দিক থেকে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ রাস্তা পাড়ি দিতে পারেনি। এখনো পর্যন্ত আমি বলব এই বিষয়ে অনেক বেশি অবহেলা রয়েছে।

তেমনি নেতৃত্বে ক্ষেত্রে ডঃ আব্দুল মুহসিনের[২১] কথা উল্লেখ করছি যিনি বলেছিলেনঃ হে ভাইয়েরা, আমদেরকে বাস্তবেই নিজেদেরকে পুনরায় যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সদস্যরা তাদের নেতৃত্বকে কি হচ্ছে এবং কি অর্জিত হচ্ছে তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ আমরা অনেকটা শিয়াদের মত হয়ে গেছি, ফলে কেহ নেতৃত্বকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না বা কোন জিনিসে আপত্তি তুলতে পারে না। কেমন যেন এখানের বিষয়গুলো আপত্তি তোলার অনুপযুক্ত এবং সেগুলো নিয়ে নেতৃত্তের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ।

যার ফলে নেতৃত্ব অপূর্ণাঙ্গ, অধিকাংশ নেতারাই শূরা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে না। আবার কিছু নেতৃত্ব শূরা বাস্তবায়ন করে কিন্তু নেতার পাশে শূরাগণ স্পষ্ট থাকে না। অর্থাৎ তাদের তিন, চার বা পাঁচজন নিকটবর্তী সঙ্গী থাকে যাদের সাথে সর্বদা পরামর্শ করে। কিন্তু সেখানে স্পষ্ট গঠন প্রণালি থাকে না, যারা এক, দুই, তিন ইত্যাদি নম্বরে বিভক্ত থাকবে।

---

[২১] সংক্ষিপ্ত টীকা

অধিকাংশ শুরার মধ্যে নেতা থাকেন এক নম্বরে এবং তারপরে সরাসরি নয় নম্বরের ব্যক্তি থাকে। অর্থাৎ যে সক্ষমতার দিক থেকে নয় নম্বরে। দুই বা তিন হওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি থাকে না। এ বিষয়টা সিরিয়ার জিহাদে কমান্ডার আদনানের অধীনে আমাদের সাথে সংঘটিত হয়েছে। শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জামের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতাতেও এমনটা হয়েছে। ফলে আপনি সেখানে স্পষ্ট গঠন দেখতে পাবেন না, বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের কাছে এই বিষয়টা উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি।

এখন আসি তৃতীয় উপাদানে যা, অর্থনীতি। এখনো অর্থনীতির পরিকল্পনাগুলো অনেক বেশি অবেহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ যা থেকে বেচে থাকা আবশ্যক।

চতুর্থ অংশ হচ্ছে সামগ্রিক পরিকল্পনা থাকা। অনেক দলই দাবী করবে তাদের কাছে পরিকল্পনা রয়েছে, নিরাপত্তার কারণে যা যাচাই করাও সম্ভব না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যদি তাদের নেতৃত্ব পর্যায়ের সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করেন, তখন দেখবেন তাদের কোন পরিকল্পনা নেই।

আমার এই কথার উদ্দেশ্য নয় যে, প্রত্যেকেই নিজ জামাতকে অপছন্দ করা শুরু করবে ও সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। আমি এমন কাজের দিকে আহ্বান করছি না, কারণ এতে আপনার সংগঠন থেকে বের হয়ে আরো ভাল সংগঠনে যাবেন না বরং এক সংগঠন থেকে বের অন্য সংগঠনে যাবেন যাদের ভিন্ন কোন ত্রুটি রয়েছে। তাই উম্মাহর ইসলাহের ক্ষেত্রে নিজের জন্যে যে সংগঠন বাছাই করেছে তাতে অবস্থান করাই আবশ্যক। এমন নয় যে, আপনি কোথাও পাচটি বা দশটি ভুল দেখে বলা শুরু করবেন, আমাকে এই সংগঠন থেকে বের হয়ে অন্য একটি খুজতে হবে। আমাদের নিয়তি হচ্ছে সেখানেই কাজ করে যাব, কেননা আমরা যুদ্ধাবস্থায় রয়েছি। আমরা এই সংগঠনের ভুল বের করব শুধরানোর জন্যে, তা থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্যে নয়। এমনকি মানুষ বিরক্ত হয়ে যাওয়ার জন্যেও নয় ফলে তারা বলবে; আমরা কাজ ছেড়ে দিব।

সামগ্রিক ভাবে আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি, কারণ তিনি আমাকে পেশওয়ারে নিয়ে এসেছেন যেখানে আমি জিহাদী ও অজিহাদী অধিকাংশ সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে সাক্ষাত করেছি। আমি বলব, এখানে সবাই উপযুক্ত স্তরে নেই। এটা সত্য এখানে অনেক প্রয়োজনীয়তা, দূরত্ব, শত্রুর আক্রমণের ফলে

সব সমাধান সক্ষমতার উর্ধ্বে; তবে অনেক সমস্যা আছে যা সংশোধন করা সম্ভব। তাই সর্বোচ্চ সাধ্য দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। শুধু বিমান উড্ডয়ন ব্যতিত বিশ্বের বুকে সামরিক বিদ্যার এমন অংশ বাদ নেই যা পেশওয়ারে মুজাহিদদের সামরিক ক্যাম্পগুলোতে নেই। তাহলে কেন সংগঠনগুলো তার সদস্যদের মাঝে এই যোগ্যতাগুলো তৈরির পরিকল্পনা গ্রহন করে না? অর্থাৎ তাদের কাছে কমপক্ষে একজন করে সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি থাকবে, যাতে তারা যদি অন্য কোন যুদ্ধ ভূমিতে যাবে তখন তাদের কাছে এই বিদ্যাগুলো পরিপূর্ণ থাকে।

এমন কোন সংগঠন রয়েছে যারা রাজনৈতিক শরয়ী ইলমের প্রত্যেকটা মূলনীতি একত্রিত ও আত্বস্ত করেছে? কেহ এই কাজটি করে নি। আমরা এমন পদ্ধতিতে তাওয়াক্কুল করছি যাতে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। তাওয়াক্কুল অনেক সুন্দর বিষয় যা ঈমানের অংশ। কিন্তু আমরা এমনভাবে তাওয়াক্কুল করি যাতে সমস্যা রয়েছে।

আল্লাহ যেন আমাদের পরিশুদ্ধ করে দেন। আমাদের বুঝ ও বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য পরিমাণে পরিপূর্ণ হয়েছে কিন্তু বাস্তব প্রস্তুতি গ্রহণ করি নি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আমরা জিহাদ শুরু করব অতঃপর সাথে সাথে ফেরেশতা নাযিল হবে। যখন আমরা ব্যর্থ হই তখন এই বিষয়ের দায়ভার ছেড়ে দেই এবং তাকদীর ও ফায়সালার দিকে ফিরে যাই। তখন আমরা বলি, পরাজয়ের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই অথচ এটাও এক প্রকারের পরাজয় এবং পরাজয়ের অংশ।

আমি আফসোসের সাথে বলছি, আমরা বিশৃংখল অবস্থায় আছি। আমরা ইসলামী আন্দোলনের একটি অংশ আর ইসলামী আন্দোলন উম্মাহর একটি অংশ। বর্তমান উম্মাহ পিছিয়ে পড়া একটি জাতি। ফলে ইসলামী আন্দোলনগুলো এই উম্মাহর ব্যর্থতার কিছু অংশ ধারণ করেছে, আর আমরা এসে সেই আন্দোলনের ব্যর্থতার কিছু অংশ ধারণ করেছি। তাই এই বিষয়গুলো অনেক পর্যালোচনা এবং নিজেদের কার্যক্রমকে পুনরায় যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা কুরবানী পেশ করার দাবী করি, কিন্তু এখানে ত্যাগ ও কুরবানী অনেক স্তর রয়েছে সেখানে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। আপনি আমাদের অভিজ্ঞতা, আন্দোলনগুলো অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের সক্ষমতা সাথে হিজবুল্লাহ অভিজ্ঞতা ও শিয়াদের অভিজ্ঞতাকে তুলনা করুন। তারা আগে কোথায় ছিল আর এখন কোথায় পৌঁছেছে! আপনি শুধু তাদের সফলতার পরিমাণ এবং আমাদের সফলতা পরিমাণের মধ্যে তুলনা করুন।

গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে, আমাদের পুনরায় ফিরে দেখা দরকার। আমরা যদি এই পুনরায় ফিরে দেখার কাজটি না করি তাহলে আমাদের সামনে লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারায় সর্বশেষ কারণ বাকি থাকবে।

হাদিসের মধ্যে এসেছেঃ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোন কাজ গ্রহণ করেন না ততক্ষণ তা খালেস ও সঠিক না হয়)।

ইখলাস হচ্ছে অন্তরের বিষয় যা আমাদের প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে সংযুক্ত। কিন্তু সঠিকতার বিষয়টি সাংগঠনিক বিষয় যা মানহাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মুহাদ্দিসগণ 'সঠিক' এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিতাব এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। আমরা আকীদার ক্ষেত্রে কিতাব এবং সুন্নাহকে খুব কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিতাব-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে পারি নি। তাই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে এই অংশটিও পূর্ণ করতে হবে।

তবে এমনটা হতে কোন ব্যক্তি ব্যর্থ হবে ও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না কিন্তু কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাকে কবুল করে নিবেন। আমরা নিজেদেরকে অন্তত কবুলের রাস্তায় গণ্য করতে পারি কেননা আমরা কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেছি। তবে ইখলাসের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে তার অন্তরের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত, সে কি মুখলিস নাকি মুখলিস নয়। এখন আরেকটা বিষয় বাকি থেকে যাবে, তা হল আমরা কাঙ্খিত ফলাফল আসা পর্যন্ত কাজ করে যাব।

আমরা অন্যদের উপর দোষারোপ করি, কেন অনেক শর্ত লাগায় এবং অনেক কিছু প্রস্তুত হওয়াকে শর্ত করে যাতে জিহাদ করতে না হয়। কিন্তু আমরা ঠিক উল্টো, আমরা কোন ফাউন্ডেশন চাইনা, কোন ভিত্তি চাই না এবং কোনো চিন্তা করতেও চাই না, এটা ভুল।

আমরা বিরোধী পক্ষগুলোকে যতেষ্ঠ পরিমান ভুল ধরেছি। তাই আমি বলব, এখন আমাদের নিজদেরকে গঠনমূলক পদ্ধতিতে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা দরকার। এই গঠনমূলক পদ্ধতি অসম্মানজনক পদ্ধতিতে হতে পারবে না যে, প্রত্যেক সদস্যই গিয়ে বলবে, আমার সংগঠনে এই এই ভুল রয়েছে। বরং নির্দিষ্ট পন্থায় মাসুল ভাইয়ের কাছে গিয়ে তার বক্তব্য পেশ করবে। বাস্তব কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা সংগঠনে দুর্লভ কিছু ব্যক্তি থাকে যারা পর্যবেক্ষণ করে নসিহত পেশ

করতে পারে। সে সমস্ত ব্যক্তি উপর নেতৃত্বকে যথাসম্ভব নসিহত করে যাওয়া আবশ্যক এবং নেতৃত্ব উপর তা গ্রহণ করা আবশ্যক। বরং আমি অন্য দিক থেকে বলব; যদি নেতৃত্ব নিজেকে লক্ষ্য বাস্তবায়নে বা পরিস্থিতি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে অক্ষম মনে করে তখন নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়া আবশ্যক।

অর্থাৎ আমাদের এখানে কোনো ব্যক্তি নেতৃত্ব গ্রহণ করার অর্থ সে জীবনের শেষ পর্যন্ত সরবে না। ইহা শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্দর কিন্তু যোগ্যতার একটি ব্যাপার রয়েছে। আমরা বিশাল সংকটে রয়েছি আর আমাদের সমস্ত সংকট চিন্তাগত সমস্যা এবং নেতৃত্বের সমস্যার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে, এর বেশি কিছু নেই। হয়ত আমাদের ফিকির অন্যদের থেকে ভিন্ন বা আমাদের নেতৃত্ব অন্যদের থেকে ভিন্ন। আমাদের মধ্যে স্বাভাবিকত ইখলাস ও কুরবানী করার গুন পাওয়া যায়। তবে সব সঙ্কট ফিকির ও নেতৃত্ব থেকেই হয়। আমরা অন্যদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সমালোচনা করেছি, তাই এখন আমাদের নিজেদের দিকে তাকানো দরকার। আমরা এই বিষয়গুলোকে আবার পর্যালোচনা করব এবং জিজ্ঞেস করবো কেন আমরা সফল হচ্ছি না? কুরআনে কারীমের এই বিষয়ে অনেক প্রমাণ রয়েছে এবং সেই সাথে সুন্নাহতেও রয়েছে। তাই আমাদের নিজেদেরকে পর্যালোচনা করা আবশ্যক এবং আমরা বুঝার চেষ্টা করব কোথায় সফল হয়েছি এবং কোথায় ভুল হয়েছি। কোন ধরনের চিন্তা ছাড়া শুধু কাজ করা আমাদের জন্য উচিত নয়।

সুতরাং ইসলামী দলগুলো পূর্বে গর্তগুলোতে পতিত হয়েছে। আল্লাহর শুকরিয়া আমাদের ভুল অন্যদের থেকে অনেক স্বল্প, তাই সফলতার জন্য আমাদেরকে তা শুধরে নিতে হবে। আল্লাহ তাউফীক কামনা করছি।

জিহাদী দলগুলোর মাঝে ঐক্য সাধন এবং ইখতিলাফের কারণঃ

এখন ব্যাপক প্রচলিত একটি চিন্তা নিয়ে কথা বলবো। আমি লক্ষ করেছি এখানে মুসলিমদেরকে ঐক্য, ইসলামী জামাগুলোতে ঐক্য ও জিহাদী দলগুলোর মাঝে ঐক্যের ব্যপারে অনেক বেশি আবেগে উত্তেজনা রয়েছে। মানসিক আগ্রহ অনেক ভালো এবং সঠিক। সুন্নাহ থেকে এই ব্যাপারে অনেক দলিল রয়েছে, মুসলিমদের ঐক্য করা আবশ্যক। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সে আমরা মানুষকে ঐক্য করব যাতে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি এবং

আমাদের কাজ বাস্তবায়ন করতে পারি। আর এই ঐক্য যাতে বেহুদা না হয় সেজন্য সঠিক চিন্তাধারা বা মানহাজের উপর ঐক্য হওয়া আবশ্যক।

যেমনটা আপনাদেরকে বলেছি, আমি কথায় অনেক স্বচ্ছ থাকার চেষ্টা করি, তাই আমার কথা কাউকে কষ্ট পেলে ক্ষমা চাই। আমি লক্ষ করেছি, যে সমস্ত ভাইয়েরা জামাতুল ইসলামিয়্যাহ ও জামাতুল জিহাদের মাঝে ঐক্যের কথা বলেন তারা বিষয়টা অনেক সহজ ভাবে উপস্থাপন করেন। কেমন যেন অমুক অমুকের মাঝে ব্যক্তিগত মতপার্থক্য হয়েছে, আমরা গিয়ে তাদেরকে বললাম তোমরা একত্রিত হয়ে যাও। তখন তারা বলল, আমরা ঐক্য হয়ে গেলাম।

আমিই দুইটা জামাতকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করছি কেননা আমি তাদেরকে বাস্তবে ভালবাসি এবং তাদেরকে মুজাহিদদের সারির অন্তর্ভুক্ত মনে করি। তবে এই দুই দলকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করেছি এমন বিষয়ের জন্য যা ভাইদেরকে অনেক বেশি পেরেশান করে দিচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে, এখানে তিনটা বিষয় ঐক্য হওয়াকে বাধা দিচ্ছে।

প্রথমত চিন্তাধারা ও মানহাযে পার্থক্য।

দ্বিতীয়তঃ আচরণগত পার্থক।

তৃতীয়তঃ চাহিদা ও নফসের লোভ।

ঐক্য অবশ্যই সিয়াসাতুশ শরিয়াহর মানহাজ ও লক্ষে হওয়া আবশ্যক। আমি এখানে এখানে জামাতুল ইসলামিয়্যাহ ও জামাতুল জিহাদের সাথে সাক্ষাত করেছি। আমি এই দুই জামাতের মাঝে সিয়াসাতুশ শরিয়াহর ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতা পাই নি, একটি বিষয় ব্যতিত যা উল্ল্যেখ করাই হয় না; তা হচ্ছে সাহায্যকারীদের বিধান। জামাতুল জিহাদ ত্বাগুতের সাহায্যকারীকে দলগত কাফের মনে করে, তবে তাদের মধ্যে যারা মুসলিম তারা ভিন্ন। কিন্তু জামাতুল ইসলামিয়্যাহ যাদের নেতৃত্বে রয়েছে শাইখ উমর আব্দুর রহমান -যার সাথে আমি আলোচনা করেছি- শুধু শাষক ছাড়া বাকিদেরকে তাকফির করেন না। তাগুত্বের সাহায্যকারীকে মুসলিম মনে করেন যাদেরকে কখনো তাকফীর করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমি মনে করি জামাতুল জিহাদের কাছে সাংবিধানিক নীতিমালা সম্পর্কে বেশি বুঝ রয়েছে, যার ফলে তারা শাসক ও সাহায্যকারী সকলকে কাফের মনে করে -আমি এই মানহাজে

রয়েছি- কিন্তু অন্যরা মনে করে শুধু শাসক হচ্ছে ফেরাউন এবং মুরতাদ। তবে এই এখতেলাফ এত বড় নয় যা ঐক্যকে বাধা সৃষ্টি করবে।

যেমনটা বলেছি, কোন দুই দলের মাঝে মতানৈক্যের তিনটি কারণ থাকে।

প্রথমত মানহাজ, এই দুই দলের মাঝে মানহাজের ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতা নেই।

দ্বিতীয়তঃ কাজের আচরণ বিধি, এই দুই দলের মাঝে কাজের আচরণবিধি নিয়ে বিশাল মতপার্থক্য রয়েছে। জামাতুল ইসলামী সমান্তরালভাবে কাজ করে, তাদের কাজের মধ্যে অনেক খোলাখুলি রয়েছে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। তাদের কার্যক্রম অনেকটা প্রকাশের মতই, তারা একটি মূলনীতি বাস্তবায়ন করে। সেই নীতিটি হলো " প্রকাশ্য দাওয়াত ও গোপন সংগঠন"। এই স্লোগানটি চরমভাবে ব্যর্থ। সিরিয়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। কেননা প্রকাশ্য দাওয়াত সর্বদাই সাংগঠনিক গোপনীয়তাকে ধ্বংস করে দেয়। কেননা তখন প্রশাসন দাওয়াতে একটি সুতা ধরে টান দিয়ে সংগঠনের অন্য সমস্ত সদস্যদের কাছে পৌঁছে যাবে। আমি সামষ্টিকভাবে বলছি, জামাতুল ইসলামী একটি প্রকাশ্য জামাত যারা মিশরী জনসাধারনের মাঝে অনেক বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। যদি কয়েক বছর পর উচু স্তরের কোন জামাত প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে জামাতুল ইসলামী যে বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করেছে তাতে তারা উপকৃত হবেন। কিন্তু তাদের বর্তমান পদ্ধতি অনেক ব্যর্থ অথচ তারা এই পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে তানজীমুল জিহাদ গোপনীয় পদ্ধতিতে কাজ করে। যারাই তাদের সাথে সম্পর্ক করেছে প্রত্যেকেই তাদের কাছ থেকে সেটা বুঝতে পারবে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তারা গোপন সংগঠন যারা গোপনীয় পদ্ধতিতে কাজ করে।

আমি বলব, এই দলের এই পদ্ধতি ও সেই দলের অন্য পদ্ধতি। দুই দলের মাঝে কখনোই ঐক্য হবে না যতক্ষণ না দুই দলের নেতৃত্ব একত্রিত হয়ে একটি সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করব। শরিয়াতের বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা ঐক্যকে বাধা দিতে সক্ষম। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক মতপার্থক্য নিয়ে দুইপক্ষ বসে আলোচনা করে একটি সমাধানে পৌঁছা সম্ভব। তাই এই ভূমির অনুকূল পরিবেশ বুঝার জন্য গভীর ও ব্যাপক গবেষণা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পৌছাতে হবে যার ভিত্তি হবে ঐক্য, তাই বিষয়টা অনেক গভীর।

ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, ব্যক্তিগত চাহিদা। যদি কোথাও এমন দুই দল থাকে যাদের মধ্যে সিয়াসাতুশ শরিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মতপার্থক্য নেই তাহলে কেন তাদের মাঝে ঐক্য হচ্ছে না? উদাহরণস্বরূপ আফগান মুজাহিদদের মাঝে কেন ঐক্য হচ্ছে না? এর মূল কারণ এই পক্ষে বা অপরপক্ষে নফসের চাহিদা প্রবল হওয়া অথবা সংগঠনের মধ্যে।

আমি ইতিহাস পড়েছি, মুসলিমদের ইতিহাসে কখনোই তরবারি ছাড়া ঐক্য অর্জিত হয়নি। মুসলিমদের ইতিহাস মতপার্থক্যে পরিপূর্ণ, ইবনে কাসীরের বা অন্যদের ইতিহাস পড়লে সেটা পেয়ে যাবে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরেই মতপার্থক্যের বীজ প্রকাশিত হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় পার হওয়ার আগেই ব্যাপকভাবে মতপার্থক্য ছড়িয়ে পড়েছে। উমাইয়াদের ইতিহাসে আরব ও আরব এবং আরব ও অনারবদের মাঝে এত পরিমান যুদ্ধ হয়েছে যা সবকিছুকে প্লাবিত করেছে। তেমনি ভাবে আব্বাসীয়দের সময়ে নিজের মাঝে যুদ্ধগুলো অনেক প্রসিদ্ধ। কিন্তু জালেমও হলো যেহেতু ইসলামী শাসক ছিল এবং ইসলামী শরিয়া বাস্তবায়িত হচ্ছিল, তাই ইসলাম তার নিজেকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রেখেছিল যার সাথে প্রশাসনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের আসল বিপদ শুরু হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর থেকে খুব অদ্ভুত পদ্ধতিতে।

তাই আমার কথা হচ্ছে, যারা মুসলমানদের ইতিহাস পড়বে তারা সেখানে অনেক মতপার্থক্য দেখতে পাবে। এখানে অনেক অঞ্চল ছিল ইসলামের ইতিহাসে যার চমক অনেক উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু তাদের মূল সমস্যা ছিল ইখতিলাফ। সম্ভবত এটাই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসের ব্যাখ্যা যেখানে তিনি বলেছেনঃ

"আমি আমার রবের কাছে তিনটি দোয়া করেছি, আমাকে দুইটা দেওয়া হয়েছে এবং একটা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। রবের কাছে চেয়েছি যাতে আমার উম্মত মহামারীতে ধ্বংস না হয় ফলে আমাকে তা দেওয়া হয়েছে। আমি উনার কাছে চেয়েছি যাতে আমার উম্মত ডুবে শেষ না হয় তখন আমাকে তা দেওয়া হয়েছে। আমি উনার কাছে চেয়েছি যাতে তাদের বিপদ নিজেদের মধ্যেই না দেওয়া হয় তখন আমাকে তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে।"

সুতরাং এই বিষয়টা অনেক স্পষ্ট। এসমস্ত ইখতিলাফ গুলো মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা, আমাদেরকে অবশ্যই তা দূর করতে হবে; কেননা তা দূর করা বিজয়ের কারণ।

সুতরাং কখনোই ইসলামী দল গুলোর মাঝে ঐক্য হবে না যতক্ষণ না সেখানে সিয়াসাতুশ শরিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে একক মানহাজ না থাকবে, অতঃপর একক ইলমি কর্মপদ্ধতি না থাকবে এরপর নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদা দূর না হবে। যদি ব্যক্তিগত চাহিদা দূর না হয় তাহলে মুসলিমদেরকে আমরা এক করতে পারবো না।

ঐক্যের ক্ষেত্রে মানহাজের সম্পর্ক কি?

আমি মনে করি ঐক্যের সকল জিহাদী জামাত একটি সহজ ও সম্ভব বিষয় আঞ্জাম দেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক করে দিবে। অর্থাৎ আমরা এই কাজে সফল হলে আমাদের আজকের সন্তান ও অল্পবয়সী যুবকরা ভবিষ্যতে এক হয়ে যাবে। আর সেই বিষয়টা হচ্ছে এখনই সকলের মানহাজ এক করে ফেলা। অর্থাৎ সমস্ত জামাত একসাথে হয়ে একটি সম্মিলিত মানহাজ উপস্থাপন করবে এবং প্রত্যেক দল তাদের সন্তানদেরকে এর উপর গড়ে তুলবে। যাদেরকে এই মানহাজের উপর গড়ে তোলা হবে -চাই ইরাকি হোক বা সিরিয়ান বা মিশরী বা আযমী- কয়েক বছর পর তারা ঐক্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। ফলে তখন এমন পরিবেশ তৈরি হবে যা সেই সমস্ত মানুষকে ঐক্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

কিন্তু আফসোস এর সাথে বলছি আমরা বর্তমানে ঐক্যের জন্য প্রস্তুত নই। এই কথাটি অনেক কষ্টদায়ক, কিন্তু বাস্তবেই এখন আমরা ঐক্যের জন্য প্রস্তুত নই। কারণ এখনো বিশাল পরিমাণ লোভ-চাহিদার অনুসরণ করা হয়, অসংখ্য মানুষ নিজের মতের উপর আশ্চর্য বোধ করে, অনেকেই নিজ স্বার্থের জন্য চেষ্টা করে। তবে আমার কথা হচ্ছে এখনো অনেক আশা বিষয় আছে কিন্তু তার জন্য প্রত্যেকটা বিষয় খুব গভীরভাবে গবেষণা করা দরকার। যা আমরা মানহাজ দিয়ে শুরু করব।

ইতিহাসে কখনোই তরবারী ছাড়া মুসলিমদের ঐক্য সম্ভব হয়নি। কোন জাতি নিজে স্বেচ্ছায় ঐক্য হয় না। বরং হয়তো এমন কোন আক্রমণ হতো যা মুসলিমদের শুরু থেকে শেষ সবাইকেই প্রকম্পিত করত, যেমন তাতার বা ক্রুসেডার বা যুদ্ধ ও বিপদ। ফলে ব্যাপক পরিমাণে মানুষের অন্তর নরম হত এবং অনেকের মাঝেই ইখলাস তৈরি হতো। ফলে তারা ঐক্যের আহ্বান করতে থাকতো তখন মুসলিমদের মধ্য থেকে অনেক জামাত উঠে দাঁড়াত, কিন্তু একটি জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাওফিক দিতেন, ফলে তারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হতো। সেই জামাতটি শত্রুর বিরুদ্ধে বাস্তব বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারত এবং মানুষের অন্তর জয় করে নিত। ফলে অন্যান্য সকল জামাত সেই জামাতের জন্য রাষ্ট্র গঠন করে দিত।

অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ আফগানে এখন যদি কোন নেতার নেতৃত্বে কোন জামাত কাবুলে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনে, তখন আমি নিশ্চিত যে আরও অনেক জামাত ও দল তাদের হয়ে কাজ করবে।[২২] তেমনি ভাবে জামাতুল ইসলামিয়া যদি কোন রাষ্ট্রে অভ্যুত্থান ঘটায় এবং সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাহলে অসংখ্য দল নিজের লোকদের চাপ সৃষ্টি করবে যাতে সেই জামাতের সাথে মিলিত হয়। যদি আমরা ধরে নেই সেখানে অনেক মুখলিস মানুষ রয়েছে তাহলে এরা সবাই তাদের সাথে একত্রিত হবে। হয়ত স্বল্প কিছু ব্যক্তি বাকি থাকবে যারা নেতৃত্ব জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে এবং বিজয়ী জামাতের সাথে মিলিত হবে না। ইসলামের ইতিহাসে সর্বদা এমনটা ঘটেছে, তোমরা সব পড়ে দেখো।

যেই শক্তি বিজয় ছিনিয়ে আনবে তাদের জন্য শরিয়াহর এমন একটি অবস্থান তৈরি হবে যার দ্বারা অন্যদের চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। কেননা তখন তারা মুতাগাল্লিব বিল-কুওয়াহ্ পরিণত হবে যেমনটা বিশেষজ্ঞগণ নামকরণ করেন। তারা শক্তির মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছে এবং তাদের ইমারত শরয়ী ইমারত। ফলে তারা অন্যদেরকে বায়আত দেওয়ার আহ্বান জানাবে, যদি কেহ অস্বীকার করে তখন বায়আত দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে।

---

[২২] তাহলে এটি তালিবান আন্দোলনের আগের আলোচনা। এখানে টীকা যুক্ত করতে হবে। যে শায়খের কথা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

হুবহু এই বিষয়টা সালাউদ্দিন আইয়ুবী এবং সাইফুদ্দিন কুতুজের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে। কুস্তান্তিনিয়্যাহ বিজয়ের পর মোহাম্মদ আল ফাতেহর সাথে হয়েছে। তখন উসমানী সাম্রাজ্য অনেক বছর শুধু তুর্কিতে একটি ইমারত হিসেবে টিকে ছিল। কিন্তু কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের চার বা পাঁচ বছরের মধ্যেই তারা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ফলে তারা আরব বিশ্বের উত্তর দিক থেকে প্রবেশ করে এবং হালাব বিজয় করে নেয়। হালাবের গভর্নর যখন বাধা দেওয়ার ইচ্ছা করে তখন মানুষ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে ও তাকে বন্দী করে শহরের দরজা গুলো খুলে দেয় এবং বাহিনীকে প্রবেশ করায়। কারণ এই উসমানীদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (তাদের আমীর সর্বোত্তম ও সেই বাহিনি সর্বোত্তম।) এবং এই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মদ আল ফাতেহর পরে দুই খলিফার সময়কালের ভিতর মিশন ও শামসহ পুরা আরব বিশ্ব বিজিত হয়ে যায়। সুতরাং ঐক্য দুই মাধ্যমে হয়ে থাকেঃ হয়ত সবার ফিকির কোন মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অথবা কোন জামাত বিজয় অর্জন করা।

আমরা তিনটি ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবঃ

প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে, আমরা সকল জামাত মানহাজের ঐক্য সাধনের জন্য বাস্তব চেষ্টা করব। সকল জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বসে ঐক্যবদ্ধ মানহাজ তৈরি করব। যখন মানহাজের ক্ষেত্রে এক হয়ে যাবে তখন সকলেই বিজয়ের জন্য নিজেকে পূর্ণ প্রস্তুত করার চেষ্টা লিপ্ত হবে এবং অন্যকে নিয়ে ব্যস্ত হবে না। এই সময় জামাতগুলোকে উমর ও আমরের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ঐক্য সাধনে চেষ্টায় ব্যস্ত হবে না। কেননা ঐক্য হচ্ছে একই মানহাজের অধিকারী অনেকগুলো মানুষকে মিলিয়ে দেওয়া।

অর্থাৎ যদি আমার কাছে তিনটি ঘোড়া থাকে, হয়তো প্রত্যেকটাকে একটা করে গাড়ির সাথে যুক্ত করব বা সবগুলোকে একসাথে একটা গাড়ির সাথে যুক্ত করব। যদি সবগুলোকে আলাদা রাখা হয় তাহলে সম্ভাবনা থাকে যেকোন একটি লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে। আর যদি তিনটাকে একটি ওয়াগানের সাথে বেধে দেই, একটি ডানে ও আরেকটি মধ্যে ও আরেকটি বামে, তখন অবশ্যই সেই ওয়াগানটি ভেঙ্গে যাবে এবং প্রত্যেকটা ঘোড়া একটা করে কাঠ নিয়ে ছুটতে থাকবে। না সে শুধু

ঘোড়া বা না সে গাড়ি। তেমনি ভাবে এখনই যদি ভিবিন্ন মানহাজের কয়েকটা জামাতকে একত্রিত করেন যাদের নেতৃত্বের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন, তখন আমরা ভবিষ্যতে খোঁড়া সমস্যাযুক্ত জামাত পাব। তাই আমরা মানহাজের কার্যক্রম দিয়ে ঐক্য সাধনের কাজ শুরু করব ও নিজেদের সমস্ত স্বার্থ দূর করব।

জিহাদী জামাতগুলোর মানহাজের সামষ্টিক বিষয়

মানহাজের মধ্যে এমন কিছু সিয়াসী বা রাজনৈতিক বিষয় ও বিশ্বাস সংযুক্ত থাকবে যা দ্বারা নির্ধারিত হবে -আমাদের জন্য, অন্যদের জন্য, শত্রুদের জন্য, বন্ধুদের জন্য এবং চতুর্পাশের সবার জন্য-

আমরা কারা?

আমাদের কি?[২৩]

আমরা কি চাই?

আমাদের লক্ষ্য কি?

সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি কি?

আমাদের চারপাশের শক্তিগুলোকে কিভাবে বিন্যাস করি?

মুসলিম কে এবং কাফের কে?

বন্ধু কে ও শত্রু কে?

আমরা যেখানে বসবাস করি সেই রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কি?

এটা ইসলামী রাষ্ট্র নাকি কুফুরী রাষ্ট্র নাকি ভিন কোন রাষ্ট্র?

এই শক্তির সাথে কিভাবে আচরণ করি এবং এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্টকারী শরয়ি বিধানগুলো কি?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই হচ্ছে সিয়াসাতুশ শরিয়াহর মানহাজ।

---

২৩ কোন শব্দ বাদ পড়েছে মনে হচ্ছে

ভিবিন্ন দলে সাথে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে যা পেয়েছি, তাদের সকলের মাঝে সামষ্টিক বিষয় ৫ টি ও মানহাজের ১৫টি পয়েন্ট।

জিহাদী সংগঠনকে নির্দিষ্টকারী পরিচিতিঃ

১- সংজ্ঞাঃ আমরা মুসলিমদের একটি জামাত যারা তাকওয়া ও সৎকর্মে সাহায্যের ভিত্তিতে জিহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত জিহাদি জামাত এই বিষয়টা গ্রহন করেছে।

২- আকীদাঃ পূর্বসুরীদের মানহাজের ভিত্তিতে আহলে সন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদাই হচ্ছে আমাদের আকিদা। সংজ্ঞার ভিন্নতা সত্বেও সকলেই এই বিষয়ের উপর একমত।

৩- মানহাজঃ আমাদের মানহাজ হচ্ছে পূর্বসুরীদের বুঝ অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ; নিজেদের বুঝ অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ নয়।

৪- যারা জিহাদী কার্যক্রমে লিপ্ত সেই জামাতগুলোর লক্ষ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে সবগুলো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘুরে, তা হল; মুসলিমদের এমন একটি জামাত তৈরি করা যারা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্যে শত্রুর বিরোদ্ধে যুদ্ধ করবে। এখানে কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছেঃ

- প্রথম ক্ষেত্রঃ ইসলামের দাওয়াহ ও তার সঠিক মানহাজকে ছড়িয়ে দেয়া; এই ক্ষেত্রে জিহাদী জামাতগুলো বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে অন্যদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে এবং এই ক্ষেত্রে তাদের অবদান রয়েছে।

- দ্বিতীয় ক্ষেত্রঃ মুসলিমদের সশস্ত্র জিহাদের জন্যে প্রস্তুত করা এবং সাহসিকতা পুরুষত্ব ও জিহাদের প্রশিক্ষণের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেয়া; যাতে মানুষ যুদ্ধ ও সম্মান প্রতিষ্ঠার উপর অভ্যস্ত হয়ে যায় ও অপদস্থতাকে গ্রহন না করে।

- তৃতীয় ক্ষেত্রঃ জমিনে আল্লাহ তায়ালার শাষন প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ; এটাই হচ্ছে সামগ্রিক লক্ষ্য। তবে আরো কিছু লক্ষ্য আছে যেগুলোর সাথে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই বরং এমন জিহাদ ও

লড়াই যাতে শুধু শাহাদাত রয়েছে। যেমন কেহ সম্মান রক্ষা বা সম্পদ রক্ষায় আক্রমণকারীকে প্রতিহত করল; আমরা বর্তমানে যেই জিহাদে রয়েছি। আবার অনেক জামাত রয়েছে যাদের লক্ষ্য ইসলামের বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করা বা খ্রিষ্ঠান মিশনারীদেরকে হত্যা করা।

আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বিষয় হচ্ছে, আমরা পূর্বসূরীদের মানহাজে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জামাত যারা অস্ত্র ধারণের ইচ্ছা রাখি, যাতে এই সমস্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুদ্ধ করতে পারি। লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম হচ্ছে সহিংসতা; আমরা এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে সহিংসতা ব্যবহার করি।[২৪]

জিহাদী আন্দোলনের মানহাজে মৌলিক ও অবিচল বিষয়সমূহঃ-

আমরা এখন জিহাদী আন্দোলনের মানহাজে মৌলিক ও অবিচল ১৫টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবঃ

প্রথম বিষয়ঃ বর্তমানের প্রচলিত সকল সংবিধান কুফুরী

প্রথমত আমরা ইসলামী বিশ্বের সমস্ত সংবিধানকে কুফুরি সংবিধান হিসেবে গণ্য করব। আমরা বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের সংবিধানকে ইসলামি হিসেবে গণ্য করব না, সবগুলোই কুফুরী সংবিধান। পূর্বে এই বিষয়ে অস্পষ্টতা ছিল, কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধ সকল মতানৈক্য দূর করে দিয়েছে।

পূর্বের প্রশ্নগুলোর মধ্যে ছিল যা অনেকে বলেছেন, পাকিস্তানের জিয়াউল হক্ব শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অনেক বলেছেন, সৌদী ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করে। কেহ বলেছেন, সুদান ইসলামী শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে। এই প্রশ্নগুলো ছাড়া অন্যদের ব্যপারে জিহাদী সংগঠনগুলোর মাঝে কোন মতানৈক্য নেই। বানানো আইন ও সংবিধান ব্যপারে অ-জিহাদীরাও একমত যে এগুলো কুফুরী সংবিধান।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, সৌদীর ব্যপারটা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। সৌদীর কুফুরীর বিষয়ে যার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে, শাইখ মাকদেসীর কিতাব "আল কাওয়াশিফুল

[২৪] এখানে শাইখ চতুর্থ ও পঞ্চম পয়েন্টকে সংযুক্ত করে ফেলেছেন।

জ্বালিয়্যাহ”[২৫] এর মধ্যে পূর্ন সমাধান পেয়ে যাবে। তিনি এমন কোন ছোট্ট ঘটনা বাদ রাখেন নি, যা দ্বারা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে সৌদীর কুফুরী বেশি হওয়া প্রমান করা যায়। যেমন, সুদকে বৈধতা দেয়া ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ইত্যাদি সকল কুফুরী। আল্লাহকে সাক্ষির রেখে বলছি তারা কাফের এবং অন্যদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট।

সুদানের শাসকের কুফুরীর ব্যপারে মানুষের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আমি বলব, সুদানের বর্তমান সংবিধান আল্লাহর বিধান নয় বরং আল্লাহর বিধানের বিপরীত নীতিমালা। আমি এই মুহুর্তে প্রশাসনের বিরোধীতা করছি না বরং বিরোধীতা করছি তাদের সংবিধান ও নীতিমালার; এই সংবিধানে আল্লাহর বিধানের বিপরীত নীতিমালা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (যে আল্লাহ তায়ালার নাজিলকৃত বিষয়ে ফায়সালা না করবে, তারাই হচ্ছে কাফের।)

এই আয়াতের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন নি “তবে যারা বলবে দুই বছর পর থেকে আমরা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করব তারা কাফের না”। সুতরাং যাদের ভবিষতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের নিয়ত আছে বা আল্লহর বিধান বাস্তবায়নের ইচ্ছা রয়েছে তাদেরকে আলাদা করা হয় নি। তাই যারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে তারা মুমিন ও যারা বাস্তবায়ন করবে না তারা কাফের। সংবিধান হচ্ছে কুফুরী সংবিধান। এখন তাকে সুযোগ দিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করব কিনা তা ভিন্ন বিষয়।

এই অংশটি মানহাজের মৌলিক বিষয়। যে জামাত এই কথার উপর বিশ্বাস রাখবে না তারা জিহাদী জামাত নয় ও কখনোই জিহাদ করতে পারবে না। যদি জিহাদ করেও শরিয়াহ ও যুক্তিগত ভাবে তারা পরাজিত হবে; কেননা তারা এমন ব্যক্তিদের সাথে যুদ্ধ করছে যাদেরকে তারা মুসলিম মনে করে।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফায়সালাকারী শাষককে তাকফীর

[২৫] পূর্ণ নাম আরবী ও বাংলায় এবং শর্টলিঙ্ক

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, স্বয়ং শাসককে তাকফীর করা। কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলের মাধ্যমে বর্তমানের সমস্ত শাসক কাফের। যে সমস্ত দলীলগুলো ওয়ালা বারা ও হাকিমিয়্যাহর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এই সমস্ত শাষক কাফের ও তাদের বিষয়গুল একেবারেই স্পষ্ট। শরিয়াহর বিধান পূর্ণ স্পষ্ট। এখানে সিয়াসী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন হচ্ছে, সে সমস্ত জামাত শাষককে কাফের মনে করে না তারা কেন জামাত? কেন তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মুসলিম শাষককে বায়আত দেয় না ও তার সাথে মিলে যুদ্ধ করে না?

ইখওয়ানুল মুসলিমীন জর্ডানে ৫০ বছর যাবত বাদশাহ হুসাইনের কুফুরীর কথা ঘোষনা করে আসছিল, কিন্তু যখনই তারা পার্লামেন্টে যাওয়ার ইচ্ছা করল, তখন বলা শুরু করল; আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা ভুলের উপর ছিলাম, আমরা সেই কথা থেকে ফিরে এসেছি। সে হচ্ছে মুসলিম শাষক ও তার কুফুরি বড় কুফুরী নয়।

তাই এখন পর্যন্ত যে জিহাদী জামাত এই বিষয়টাকে আত্বস্ত করতে পারে নি তাদের কোন মানহাজ নেই এবং তারা জামাত হিসেবে গণ্য হবে না।

তৃতীয় বিষয়: প্রশাসনের সরাসরি সাহায্যকারীদের তাকফীর; মন্ত্রী ও এমপি

প্রশাসনের সরাসরি সাহায্যকারী মন্ত্রী এবং এমপিরা কাফের, সংবিধান অনুযায়ী তারাই হচ্ছে প্রশাসন। অর্থাৎ যদি বাদশা হুসাইন শান্তিরক্ষা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে তাহলে এটা সত্য যে সেই সিদ্ধান্ত নিবে, কিন্তু তার প্রশাসনও তার সাথে সিদ্ধান্ত নিবে। যদি এই সমস্ত দেশের সংবিধান খুলেন তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে লেখা থাকে; প্রশাসন হচ্ছে প্রেসিডেন্ট, তার সহকারী মন্ত্রী এবং তাদের সচিবগণ। তারা নিজেরাই আপনাকে বলছে, তারাই হচ্ছে প্রশাসন। অতঃপর আপনি দেখতে পারবেন সেই প্রশাসন আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফায়সালা করছে, তাহলে এর অর্থ কি?

এই বিষয়টাতে আরো গবেষণা প্রয়োজন, কারণ এই অংশে কিছু জামাতের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যে সমস্ত বিধান প্রণয়নকারী কুফুরি বিধান তৈরি করে ও সিদ্ধান্ত দেয় এবং যে সমস্ত মন্ত্রীরা এই কুফরি বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা করে তারা সবাই কাফের এবং তাদের কুফুরী প্রধান মন্ত্রীর কুফুরীর সমপর্যায়ের। কেননা মানুষ বর্তমানে ফেরাউনের স্তর এবং ব্যক্তিগত বিধানের স্তর পারি দিয়ে ফেলেছে। পূর্ব

যুগে ফেরাউন ছিল শাসক আর বাকিরা ছিল তার অনুগত, শাসনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। বর্তমানে ফেরাউন শাসক এবং তার চতুর্পাশে আরো কিছু ছোট ফেরাউনের সমষ্টি থাকে, এই ফেরাঊনী হুকুমত তাদের ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ সমস্ত মানুষ নিলেই হয় প্রশাসন।

এখন কেউ যদি বলে, আপনি কেন মন্ত্রীকে তাকফীর করছেন অথচ অন্য পদের ব্যক্তিকে তাকফীর করছেন না? আমি বলব, তাদের সংবিধানই বলছে; প্রশাসন হচ্ছে প্রেসিডেন্ট, তার সহকারি এবং মন্ত্রিপরিষদ। তাই ইহার সাথে অন্যদের কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদেরকে হয়তো অন্য কোন কারণে তাকফীর করা হবে কিন্তু আমি তাকফীরের ধারাবাহিকতা তৈরি করতে পারবো না; শাসক থেকে তার সহকারি, তারপরে তার সহকারি, তারপরে তার প্রতিবেশী এভাবে যেতে থাকলে একসময় আমি পুরো জাতিকে তাকফীর করে বসবো। এটা খারিজিদের চিন্তাধারা যার সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোন সম্পর্ক নেই, তবে যারাই শাসনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে তারা সবাই কাফের।

উলামাদের কিছু কিতাবে এই বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, যেমন ‘উমদাহ ফি ই’দাদিল ইদ্দাহ’ কিতাবে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেনঃ (নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যরা ভুলকারী ছিল)। এখানে আল্লাহ তাআলা সেই সমস্ত সেনাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা তাদের শাসকদের সাথে মিলে যুদ্ধ করত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে) এই সমস্ত ব্যক্তিরা তাগুতের পথে লড়াই করছে। যদি এক ত্বাগুত মারা যায় তাহলে আরেকজন বের হবে, কেননা ইহা একটি প্রশাসন।

চতুর্থ বিষয়ঃ সাহায্যকারী বাহিনীগুলো কাফের ও মুরতাদ

সাহায্যকারী বাহিনীগুলো কাফের ও মুরতাদ। যেমন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী। এই সমস্ত ব্যক্তিদের বিষয়গুলো অনেক জামাতের কাছে অস্পষ্ট, যেমনটা মোহাম্মদ সুরুরের জামাতের ক্ষেত্রে বলেছি। কারণ শাসকের সাহায্যকারীরা যখন আমাদের সাথে অথবা অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করে, তখন কি তারা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে নাকি তারা কুফুরের পক্ষ থেকে প্রতিহত করে যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

(যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে)?

আমরা যখন শিয়াদের ব্যাপারে বলি তাদের দ্বীন হচ্ছে কুফরি এবং তারা হচ্ছে কাফের জাতি, যদিও কিছু সাধারণ ব্যক্তিদেরকে আমরা তাকফির করি না।[২৬] আমার কাছে শিয়াদের ৫০টির বেশী কিতাব আছে, এই বইগুলোর মধ্যে যে ধর্মের কথা বলা আছে তা অকাট্য কুফুরি। যেমন কিতাবুল কাফি – এটা তাদের কাছে তেমন যেমন আমাদের কাছে বুখারী- সেখানে ১৭ টি বাক্য আছে যা সরাসরি কুফুরী।

তাই আমি যখন বলছি এই ধর্মের অনুসারীরা কাফের এবং শিয়ারা হচ্ছে কাফের জাতি, তখন এর দ্বারা তাদের প্রত্যেকেই নির্দিষ্টভাবে কাফের বুঝানো হচ্ছে না। এইজন্যই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কাছে প্রসিদ্ধ হচ্ছে রাফেজিরা কাফের জাতি, তবে তাদের মাঝে অজ্ঞ ও এমন ব্যক্তি রয়েছে যারা কাফের নয়।

আমি এই পথ ধরেই বলব, যে সমস্ত মানুষ তাদের প্রশাসনের পক্ষে যুদ্ধ করছে তারা অবশ্যই কাফের বাহিনী এবং ইবনে তাইমিয়া এই বিষয়টা পূর্ণ ফায়সালা করে দিয়েছে। কিন্তু ইহা এমনটা বুঝায় না যে প্রত্যেক সদস্য ও সেনা নির্দিষ্টভাবে কাফের। এমন হতে পারে এই বাহিনীর অধিকাংশ মুসলিম কিন্তু এটা তাদের উপর দলগত কুফুরীর হুকুমকে বাধা দিবেনা।

যদি এখন জিজ্ঞেস করা হয় সমস্ত শিয়া কি কাফের এবং তারা জাহান্নামে যাবে? আমরা তখন বলব, তারা জাতিগত কাফের তবে তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে। যদি তাদের কাছে এমন কোন দলীল থাকে যা তাদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করার মত তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রক্ষা করবেন।

এ বিষয়ে আমি আর বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না কেননা ইহা ফকিহদের জন্য নির্দিষ্ট। তবে এই বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ; তাই প্রত্যেক জিহাদী জামাতকে এই ক্ষেত্রে তার অবস্থান নিশ্চিত করা আবশ্যক। যাতে বুঝা যায় তারা এই ব্যক্তিদের সাথে যুদ্ধ করবে নাকি তাদের সাথে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকবে? যদি আমি তাদের

[২৬] মূল আরবী দেখা দরকার। এটা কি কিছু সাধারণ ব্যক্তি? নাকি শিয়াদের আওয়ামকে তাকফির করি না? – এমন বলা হয়েছে?

সাথে যুদ্ধ না করার অবস্থান গ্রহণ করি, যেমনটা জর্ডানে ইখওয়ানুল মুসলিমিন গ্রহণ করেছে, তাহলে আমি জিহাদ করবো কিভাবে?

আমরা ইহা বলতে চাইনা যে তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নির্দিষ্টভাবে কাফের, তবে আমরা এই কথায় একমত হতে চাই যে তাদেরসাথে যুদ্ধ করা বৈধ।

পঞ্চম বিষয়ঃ শাসকের কুফরীর কারণে সমস্ত জনগণকে তাকফীর করা যাবে না

সাধারণ মুসলিমগণ, শাসকের তাকফীরের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যে সমস্ত জনগণের প্রশাসনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের দিকে আমরা তাকফীরের হাত বাড়াবো না।

সপ্তম বিষয়ঃ যে সমস্ত রাষ্ট্রে কুফুরে বিধান প্রচলিত সেগুলো কুফুরী রাষ্ট্র কিন্তু জনগণের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ

যে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বর্তমানে কুফুরী বিধান প্রচলিত অথচ তাদের জনগন মুসলিম, সামগ্রিকভাবে সেগুলো মিশ্রিত রাষ্ট্র যেমনটা ইবনে তাইমিয়া বলেছিলেন। মানহাজের মধ্যে এই বিষয়টা স্পষ্ট করা আবশ্যক। এই রাষ্ট্রগুলো হুকুমের ক্ষেত্রে কুফুরী রাষ্ট্র। তবে সেখানের জনগণ মুসলিম যাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ। জিহাদের ক্ষেত্রে তাদের আক্রমণ করা যাবে না।

এই বিষয়টা প্রত্যেক জামাতকে নির্দিষ্ট করতে হবে, কেননা তারা বাস্তবতার সাথে কাজ করবে; আপনি যখন আপনার কোনো সদস্যের কাছে গিয়ে বলবেন; তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে আস, কিন্তু মানহাজের মাধ্যমে তাকে স্পষ্ট করে দেননি কে মুসলিম এবং কে কাকের, কাকে হত্যা করা যাবে এবং কাকে হত্যা করা যাবে না, তখন মানুষ মুল কাজে ইখতিলাফ করবে।

আমি এখানে কোন মাসায়ালা আবশ্যক করে দিতে চাই না। কোন জামাত এই মানহাজ গ্রহণ করতে চায় না সে অন্য কোন মানহাজ গ্রহণ করুক। তবে আমার কথা হচ্ছে, এই মূল বিষয় গুলো সমস্ত জিহাদী জামাতের মাঝে সামষ্টিকভাবে পেয়েছি। যে সমস্ত জামাতের কাছে ইহা নেই তারা যেন তাদের মানহাজ গ্রহণ

করে, তবে অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে হবে, তারা কারা? তারা কি চায়? এসমস্ত বিষয়গুলোতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি? যাতে আমরা তাদের সাথে উপযুক্ত পদ্ধতিতে আচরণ করতে পারি। যাতে এই বিষয়গুলোতে মতানৈক্য ও কেউ কাউকে বুঝাতে পারছে না, এমন না থেকে যায়।

অষ্টম বিষয়ঃ মুরতাদ শাসকের সমস্ত চুক্তি ও সন্ধি বাতিল

শাসককে তাকফীর করা আমাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়, এই সমস্ত তাগুতরা তাদের কুফুরী সহকারে যে চুক্তি ও সন্ধি করেছে তার সবকিছু বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এ বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিষয়ে একে অপরের সাথে সংযুক্ত। এই শাসকগুলো যদি বৈধ শাসক হয় তাহলে তাদের সমস্ত চুক্তি ও সন্ধি বৈধ, দখলদারদের ডেকে আনা বৈধ, খ্রিস্টান মিশনারীদের নিরাপত্তা দেওয়া বৈধ। তাই আমি হয়তো তাদেরকে শরীয়তে বৈধ মনে করব অথবা অবৈধ মনে করব। যদি আমি তাদেরকে বৈধ মনে করি তাহলে তাদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব না। তাই এই বিষয়গুলো যতই কষ্টকর হোক, এগুলো নিয়ে গবেষনা ও চিন্তা করা আবশ্যক।

আমরা পূর্বের আলোচনা এবং শাসককে তাকফীর করার উপর ভিত্তি করে বলব, তাদের সমস্ত আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক, আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত চুক্তি ও সন্ধিগুলো বাতিল হয়ে যাবে। সেই সাথে সেখানে কোন মুসলিমের নিরাপত্তা বাকি থাকবে না। যে সমস্ত জামাত তাদেরকে কাফের মনে করে না তাদের মানহাজ জিহাদী জামায়াতের মানহাজ নয় বরং তাদের মানহাজ হচ্ছে তাবলীগ বা ইখওয়ান ইত্যাদি'র মানহাজ।

কোন ইসলামী জামাতের যদি শাসক, তাদের সাহায্যকারী, চুক্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে স্পষ্ট মানহাজ না থাকে তাহলে জিহাদ করতে সফল হবে না। কেননা তারা যদি এই কাজটি না করে তাহলে অনেক মতপার্থক্য তৈরি হবে এবং গোয়েন্দা, বাহিনী, মিশনারি ইত্যাদির সাথে যুদ্ধ করার কোন স্পষ্ট দলিল থাকবে না।

এই বিষয়ে অনেক বড় আলেমগণ বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে, যেমন আলবানী ফতোয়া দিয়েছেন; আল জাযায়েরে আমেরিকানদের সাথে যুদ্ধ করা ভুল, কারণ সেখানের শাসক মুমিন।[২৭] এই জন্যেই তারা বলে; আমরা ততক্ষন পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করব না, যতক্ষণ না অধিক উপযুক্ত শাসক আসবে, যে শরিয়াহ বাস্তবায়ন করবে এবং তার ক্ষমতা ও বাহিনী থাকবে। তখন সে আমেরিকানদের যুদ্ধ করবে ও দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যদি এমনটা না ঘটে তাহলে আমাদের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। এই কথার উৎপত্তি হচ্ছে, তার মানহাজে এই বিষয়ে কোন স্পষ্ট ফায়সালা নেই।

তাই আমরা বলি, ত্বাগুতদের চুক্তিগুলো শরিয়াহর দৃষ্টিতে বাতিল ও অসম্মানিত। এই জন্যেই তাদের সাথে যুদ্ধ করি ও তা মেনে নেই না। যদি মুজাহিদদের কোন বিষয়ের সাথে তা বিরোধপূর্ণ হয় তাহলে তা স্বীকৃত নয়।

নবম বিষয়ঃ ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানদের রক্ত ও সম্পদ হালাল

তৃতীয় বিশ্বের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের পূর্বের আলোচনা, খ্রিস্টান, ইহুদী এবং জোটের সদস্যরা সম্পদ ও রক্ত পরিপূর্ণ ভাবে হালাল। এই ব্যক্তিরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে তাই পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী তাদের রক্ত ও সম্পদ পূর্নভাবে হালাল। প্রত্যেক জামাতের আচরণ, কার্যক্রম ও হুকুম হচ্ছে তাদের চিন্তাধারা ও মানহাজের স্বাভাবিক ফলাফল। কারণ এর ভিত্তিতেই আপনি বুঝতে পারবেন কেন তাবলীগীরা যুদ্ধ করে না, কেন ইখওয়ানীরা যুদ্ধ করে না। কেননা তাদের বুদ্ধিকে এমন ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে কোন জিহাদ নেই। তাই আমরা মানুষকে এমন ভাবে মাইন্ডসেট করতে চাই ও চিন্তাধারা বুঝাতে চাই যা তাদেরকে জিহাদের দিকে নিয়ে যাবে।

দশম বিষয়ঃ সমস্ত জিহাদী সংগঠনের রয়েছে বন্ধুত্ব ও সাহায্যের অধিকার

---

[২৭] সূত্র খুঁজে যুক্ত করা প্রয়োজন।

যে সমস্ত জিহাদী জামাত এই মানহাজকে গ্রহন করে নিবে তারা সকলেই একে অপরের বন্ধু। যদিও একই জামাতের না, আমাদের মধ্যে রয়েছে সাহায্যের অধিকার। কেননা আমরা পূর্বসূরিদের মানহাজে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী এবং আমরা আল্লাহর কালিমা বুলন্দের জন্যে অস্ত্র ধরতে চাই।

এগারতম বিষয়ঃ আহলে সুন্নাহর অ-জিহাদী জামাতগুলোর সাহায্য ও নসিহতের অধিকার রয়েছে

আহলে সুন্নাহর অ-জিহাদী জামাতগুলোর আল্লাহর জন্যে নসিহতের অধিকার রয়েছে। তবে কারোর উচিত না আপনাকে বলা, আপনি অন্ধ বা আপনার জামাত অন্ধ। বরং সঠিক ছিল আপনাকে বলা যে, এই বিষয় আপনার দলীল কি এবং আপনার সাথে শরয়ী পদ্ধতিতে আলোচনা শুরু করা।

কিন্তু অধিকাংশ সময় এমনটা ঘটে না। বরং আপনি যদি তাকে বলেন, তোমার জামাত অন্ধ; তখন সে আপনাকে বলবে; আরো অনেক জামাত অন্ধ।

তেমনি কিছু স্লোগান আছে যা ভুল, তার একটা হাসান বান্না রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ (আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করব যে বিষয়ে একমত হয়েছি এবং একে অপরকে অপারগ মনে করব যে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।)

এই স্লোগানের মধ্যে অনেক বেদাত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর উপর ঈমানকে আকড়ে ধরল, তখন সে শক্ত রশিকে আকড়ে ধরল।)

হাদীসে এসেছেঃ (সেই সত্বার শপথ যার হাতে আমার নফর, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে, জালেমের হাত ধরবে ও তাকে হক্কের সামনে নত করাবে বা তাকে হক্কের সামনে অক্ষম করে ফেলবে; অন্যথায় তোমাদের একজনের অন্তর অপরের অন্তরের উপর চাপিয়ে দিবেন ফলে তারা তোমাদেরকে অভিসম্পাত করবে যেমন তাদেরকে করা হত।)

হাদীসে এসেছেঃ

(তোমাদের মধ্যে কেহ যদি খারাপ কিছু দেখে সে যেন অবশ্যই হাতে বাধা দেয়, যদি সক্ষম না হয় তাহলে মুখে, যদি সক্ষম না হয় তাহলে অন্তরে; আর এটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন ঈমান।)

ইসলামী জামাতগুলোকে বলব, আমরা জিহাদী জামাত হিসেবে অন্যদের বিদাতকে কখনো ছাড় দিতে পারব না। কিন্তু আমরা কি তাদের সাথে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করব? না, আমরা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করব না। কাফেরদের সাথে আমাদের জিহাদ অস্ত্রের মাধ্যমে, আর মুসলিমদের সাথে আমাদের জিহাদ দলীল, বয়ান ও শরয়ী প্রমানের মাধ্যমে। তবে যারা কাফের দলে প্রবেশ করবে ও ত্বাগুতের আনুগত্য করবে, তাদের সাথে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করব।

বারতম বিষয়ঃ বিরোধী ওলামাদের ব্যাপারে অবস্থান

এই বিষয়টা অনেক বিরক্তিকর একটা, আলেমদের ব্যাপারে জামাতগুলোর একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। আমরা উলামাদেরকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারিঃ

প্রথমঃ একটিভ মুহজাহিদ উলামাগণ

এসমস্ত ব্যক্তিদেরকে কোন পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নাই, তারা হচ্ছেন আসল উলুল আমর, যদিও তারা কোন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত না হয়। সত্যিকারের মুজাহিদ আলেমগন সকল সংগঠনের জন্যে উলুল আমরা, তাদের কথা আমাদের মাথা ও চোখের উপর।

দ্বিতীয়তঃ স্বতন্ত্র আলেমগণ।

যেমন আলবানী, তিনি জিহাদ না করলেও ইলম দিয়ে আমাদেরকে অনেক উপকৃত করেছেন। এই ধরনের বিচ্ছিন্ন আলেমগনকে সুন্নাহ অনুযায়ী সম্মান দিব, যেমনটা ইমাম মালেক বলেছেনঃ প্রত্যেকের কথাই গ্রহণ করা হয় ও জবাব দেওয়া হয়, তবে এই কবরের অধীবাসী ব্যতিত -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-।

স্বতন্ত্র আলেমগণের তাদের মন অনেক প্রশস্ত হতে হবে, সামগ্রিকভাবে সমস্ত আলেমের বক্ষ অনেক প্রশস্ত কিন্তু তাদের অনুসারীদের অন্তর অনেক সংকীরর্ণ।

যদি আপনি আলবানীর কাছে গিয়ে তাকে বলেনঃ

আপনি জর্ডানে থাকাকালীন ফতোয়া দিয়েছেন, ফিলিস্তিনের সকল মুসলমানকে কুফুরী রাষ্ট্র যা ইয়াহুদিরা পরিচালনা করছে, সেখান থেকে নিকটবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রে চলে যাওয়া আবশ্যক।[২৮] যদি আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি তাহলে তাকে বলব; আপনি কি পরিকল্পনা করছেন? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য, একজন আলেম ১৫ লক্ষ মুসলিমকে সেই ভূমি থেকে বের করে দিবে যা মুসলিমদের জন্য হাতে রয়েছে? বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে সেখানে রাজনৈতিক অবস্থান থাকতে হবে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ কারীদের জন্য খুঁটি হিসেবে পরিণত হবে। তার এই ফতোয়ার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের শাসকগুলো মুসলিম এবং এগুলো সব ইসলামী রাষ্ট্র। ফিলিস্তিন আর ফিলিস্তিনিরা যেহেতু জুলুমের শিকার হচ্ছে তাই তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের হিজরত করা আবশ্যক। অথচ একজন ফিলিস্তিনি জানে সিরিয়া, মিশর বা জর্ডানের মুসলিমরা তাদের থেকেও বেশি চাপে রয়েছে।

তাই সংগঠনগুলোকে এই সমস্ত স্বতন্ত্র আলেমদের সাথে আচরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করা আবশ্যক। কারণ আমরা যদি এই সমস্ত বড় নামওয়ালা ও দাড়িওয়ালা ব্যক্তিদের উপর দলিল প্রমাণ দিয়ে জবাব না দেই তাহলে একসময় আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করা শুরু হবে। প্রত্যেকের কথাকেই গ্রহণ করা হয় ও জবাব দেওয়া হয়। প্রত্যেক সংগঠনে এমন আলেম রয়েছেন যারা এই আলেমদের থেকে কথা গ্রহণ করতে পারবে এবং জবাব দিতে পারবে।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছেঃ মুরতাদ আলেম। যাদের মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

- কুফুরীর উপর ঈমানের সাক্ষ্য দেয়

---

[২৮] সূত্র যোগ করা প্রয়োজন

- যে সমস্ত মুমিনরা মুরতাদদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে খারেজী ও বিদ্রোহী ঘোষনা করে। ফলে তারা বলে, এরা বিদ্রোহী-খারেজী যারা আহলে হক্কের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (তারা কাফেরদেরকে বলে, পথের ক্ষেত্রে তারা মুমিনদেরকে থেকে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত।)

- ত্বাগুতদের থেকে সম্পদ ও বেতন নিয়ে তাদের জন্যে কাজ করে।[২৯]

অর্থাৎ যে এই ধরণের কথা বলবে এবং তাদের থেকে বেতন বা জীবনোপকরণ গ্রহন করবে তারা শাষকের পক্ষে।

আমি আপনাদেরকে সাঈদ রমজান বুতির উদাহরণ দিচ্ছি। আমি যখন সিরিয়া থেকে বের হই তখন তাকে হক ও সঠিক ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষাকারী একজন আলেম হিসেবে গণ্য করতাম। কিন্তু যখন আমরা লন্ডনে আসলাম, তখন দেখি সে বলছেঃ "হাফেজ আসাদ মুসলিম ও মুমিন, সে আমার ঘনিষ্ট ছাত্র ও মুরিদের অন্তর্ভুক্ত। বরং আমি হাফেজ আসাদ ও তার স্ত্রীর নির্দেশনা প্রদানকারী" [৩০]

অতঃপর মুজাহিদদের ব্যপারে বলছেঃ এই সমস্ত মুজাহিদ যারা চিৎকার-চেঁচামেচিতে দুনিয়াকে ভরিয়ে তুলেছে, তারা কি জানেনা এই রাষ্ট্রের শাসক ইসলাম ..."

অর্থাৎ সে নুসাইরি বার্থে বিশ্বাসী কাফেরকে আমিরুল মুমিনিন গণ্য করছে এবং বলছে মুজাহিদরা ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা ইসলামকে কলুষিত করেছে এবং বিপদের কারণ হয়েছে। তাই এই আলেম মুরতাদ এবং তার ওপর হুজ্জত প্রমান হয়েছে। তার সাথে অনেক আলেম ও ভাইয়েরা আলোচনা করেছে, বিতর্ক করেছে ও নসিহত করেছে, কিন্তু সে তার পূর্বের কথার উপর অটল রয়েছে।

---

[২৯] আচরণবিধি ও সাধারণ দিকনির্দেশনার আলোকে টীকা যুক্ত করতে হবে।

[৩০] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংবেদনশীল বিষয়। বিস্তারিত টীকা দিতে হবে। যেখানে থাকবে বুতির মূল উদ্ধৃতির সূত্র ও প্রমাণ। অতঃপর বুতির পরবর্তী অবস্থান। ২০১১ এর পর আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে বাশারকে সমর্থন। নুসাইরি মিলিশিয়াদের সাহাবীদের রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলা, নাউযুবিল্লাহ, ইত্যাদি।

আমার সাথে কিছুদিন পূর্বে এক ইরাকি কুর্তি ভাইয়ের সাক্ষাৎ হয় যিনি আফগানে ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি যখন সাইদ বুতি কাছে ছিল তখন কুর্দি কিছু ভাই তার কাছে দ্বীন ও জিহাদী কার্যক্রমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে আসলো। তখন সেই ভাই তাদের দোভাষী ছিলেন। আমি বুতির উদাহরণ নমুনা হিসেবে উল্লেখ করছি। তারা তখন তাকে হামার ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তখন সে বলেঃ

সেখানের মানুষ মসজিদের আমল ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে দিয়েছে, দ্বীনের জন্য কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে এবং শাসকের কুফুরীতে বিশ্বাস করা শুরু করেছে ও দাওয়াত ছেড়ে এই বিষয়টা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেছে; ফলে তাদের সাথে প্রশাসনের দ্বন্দ্ব হয়, কেননা জিহাদীরা ক্ষমতা ও চেয়ার পাওয়ার জন্য লড়াই করছিল। ফলে তারা তাদের কাজের পরিণাম ভোগ করেছে"।[৩১]

এই ছিল হামা'র অবস্থার ব্যাপারে সেই ব্যক্তির ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে তার কাছে অনেকবার যাওয়া হয়েছে, যার ফলে তার উপর হুজ্জত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এ হচ্ছে সরকারি আলেম, যে সরকার থেকে বেতন নেয়। আমি আলোচনা দীর্ঘ করব না কেননা তার ও তার মত অন্যদের সাথে আমার আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

এই ধরনের আলেম প্রত্যেক দেশেই রয়েছে। মরক্কোর কিছু আলেম বাদশা হুসাইনের সামনে রুকু সেজদার ফতোয়া দিয়েছে, ফলে আপনি তাদেরকে দেখবেন সে যখন সিংহাসন থেকে নেমে আসে এবং লাল গালিচায় হাটে তখন আলেমরা তার সামনে ঝুকে যায়।

যে আলেম কাফেরের ব্যাপারে ঈমানের সাক্ষ্য দেয় এবং মুমিনের ব্যাপারে বিচ্যুতি, বিদ্রোহ ও খারিজি ফতোয়া দেয়। এই ধরণের আলেমরা কঠিন ভ্রষ্টতা ও রিদ্দার মধ্যে রয়েছে।

আমি বলি, জিহাদী জামাতগুলো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। যেখানে অনেক মানুষের মাথা কাটা হবে ও অনেক মানুষের সম্মান বিনষ্ট হবে। তাই আমরা যদি বন্ধু, শত্রু ও নিরপেক্ষ এবং প্রত্যেকের ব্যাপারে শরিয়াতের বিধান নির্ধারণ না করি

---

[৩১] হামা ম্যাসাকারের ব্যাপারে টীকা যুক্ত করতে হবে

এবং মানহাজ ছাড়াই চলতে থাকি; তাহলে কখনোই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না এবং মাঝপথে ধ্বংস হয়ে যাব।

আল জাযায়েরের অধিকাংশ মুজাহিদের অবস্থা হচ্ছে, যদি বিন বাজ বা অন্য কেহ ফতোয়া দেয়া আমরা ভ্রষ্ট বা খারেজী, তাহলে আমরা এতদিন যাদেরকে এত কষ্ট করে প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাদের অধিকাংশই প্রভাবিত হয়ে যাবে। তাই এই বিষয়টার একটা সমাধান প্রয়োজন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমানের উপর রেখে গেছেন। তাই আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে এই বিষয়ের সমাধান খুজতে হবে।

ইসলামে দলগুলোর ভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারে অবস্থানঃ-

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অনেক মানুষের কাছে গনতান্ত্রীক আন্দোলনের নেতাদের বিষয়টা অস্পষ্ট থাকে ফলে তাদেরকে আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ভাবতে থাকে; ফলে আপনি তাদেরকে বলতে দেখবেন; অমুকে বলেছে, গান্নুশী বলেছে, তুরাবি বলেছে। তারা তাদের সাথে এমন আচরণ করতে থাকে কেমন যেন তারা দ্বীনের অনেক বড় আলেম। এই সমস্ত ব্যক্তিরা আলেম নয় এবং তাদের কাছে আলেম হওয়ার পর্যাপ্ত শরীয়তের ইলম নেই। ইসলামী কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের সমস্ত কথা মুজাহিদ আলেমদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, তারা যা ইচ্ছা গ্রহন করবেন বা ছাড়বেন।

ভ্রষ্ট আলেমদের জবাবে গালি ব্যবহার না করাঃ-

কিছু যুবকরা যখন আলেমদের ব্যাপারে কথা বলে এবং তাদের কথার জবাব দেয় তখন তারা খারাপ শব্দ ব্যবহার করে, যা ইসলামের আখলাকে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং ইলমের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি অমুকে বা আমি এতে লিপ্ত হই, তাহলে ইহা তার বক্তার উপর ছুঁড়ে ফেলা হবে। অর্থাৎ আমরা যখন ভ্রষ্ট আলেমদের ব্যাপারে কথা বলব তখন খারাপ ভাষা ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কারণ এখানে শরীয়তের অনেক দলিল ও পরিভাষায় রয়েছে যাই যথেষ্ট। যেমন ‘মুরতাদ’ শব্দটা

শরীয়তের পরিভাষা। যদি আপনি দেখেন সে মুরতাদ তাহলে এই শব্দটি ব্যবহার করুন, কিন্তু কখনোই তাকে গালি দিবেন না।

তেরতম বিষয়ঃ জিহাদ হচ্ছে জামাতবদ্ধ ইবাদাত যার জন্যে সংগঠন প্রয়োজন

???[৩২]

চৌদ্দতম বিষয়ঃ সংগঠনের জন্যে আমীর ও আমিরের জন্যে শূরা আবশ্যক

শুরার হুকুমের ব্যাপারে আমি যেই মতটি উপযুক্ত মনে করি তা কিছু পূর্বসূরিদের মতামত। তা হচ্ছে; আমিরের জন্য শূরা আবশ্যক তবে শুরার রায় গ্রহন করা তার জন্য বাধ্যতা নয়। সুতরাং আমীরগণ পরামর্শ করবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কিন্তু যদি কোনো শুরাই না থাকে তাহলে সেটা ভুল। সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশের মত গ্রহণ করা উত্তম, কিন্তু বর্তমান দখলদারদের সময়ে শূরা অনেক জরুরী বিষয় হয়ে গেছে। তাই আমাদের জিহাদী জামাত, আমীর, শুরার পদ্ধতি প্রয়োজন ও পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

পনেরতম বিষয়ঃ সদস্যদেরকে আমাদের প্রনয়নকৃত শর্তাবলীর উপর অটল থাকতে হবে যাতে সদস্যদের স্তরে কোন ধরণের দুর্বলতা না থাকে।

এই পনেরটি বিষয় হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী জিহাদী জামাতগুলোর মানহাজের মৌলিক বিষয়, যারা সশস্ত্র সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়। আমার মত হচ্ছে, জিহাদী জামাতগুলোর মানহাজ কমপক্ষে এতটুকু বিস্তারিত হতে হবে। বরং আরো অনেক বেশি বিস্তারিত ব্যাক্ষ্যা থাকা উচিত। যদিও এক বা দুইটা বিষয়ে আমাদের সাথে ভিন্নতা থাকবে।

আমরা এতক্ষন শুধু মানহাজের ব্যাপারেই কথা বলেছি এবং অনেক ভাইয়ের মন এতটুকুতেই তাদের জামাতের ব্যাপারে সংকির্ণ হয়ে গেছে। এখন যদি নেতৃত্বের বিষয়ে আলোচনা করি তাহলে এই আরো এমন অনেক বিষয় সামনে আসবে, এরপর সম্পদ, পরিকল্পনা ও শ্রবন-আনুগত্য। মোট কথা আমরা এই আলোচনা গুলো চালিয়ে যাব যাতে আমরা নিজেরা ও চারপাশের সবাইকে সঠিক পথে

[৩২] কিছু বাদ গেছে কি?

আনতে পারি। কিন্তু কেহ যদি বলে, আমি কোন কিছু পরিবর্তন করতে চাই না বা কোন মানহাজ লিখতে চাই না, তাহলে আমি এই মারহালায় কোন উন্নতি দেখি না।

ইসলামী জামাআতগুলো শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারার কারণ কী?

||

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত শুরু থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মাত্র কয়েক বছর সময় লেগেছে। কিন্তু আমরা কেন হোঁচট খাচ্ছি? কোন সন্দেহ নাই আল্লাহ তায়ালা কখন জয়ী হব ও কখন পরাজিত হবে তা লিখে রেখেছেন, তাকদীরের বিষয়টি আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আসবাবের জগতে কেন এখনও আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি?

||

আমার মত হচ্ছে, আমি ইসলামী জামাতগুলো –জি(হা)দী হোক বা অ(জিহা)দী- চারটি গর্তের যেকোনো একটিতে পতিত হয়েছে, যা তাদের ফলাফলে না পৌঁছার মূল কারণ ছিল।

||

প্রথম ও মূল সমস্যা হচ্ছে, ইসলামের সঠিক মানহাজ থেকে দূরে থাকা এবং কিতাব ও সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ না করা। স্বার্থ, বুদ্ধির চাহিদা এবং নেতাদের

স্বার্থের মানসিকতাকে ইসলামী শরিয়ার নীতিমালার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ ইসলাম আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করার পর নিজেদের চাহিদা ও স্বার্থের অনুসরণ করা এবং সেটাকেই তাদের মূলনীতি বানিয়ে ফেলা।

।।

আমি এই ধারার অনেক বড়দের সাথে সাক্ষাত করেছি ও কথা বলেছি। এক নেতা আমাকে বলছিল “প্রথমে স্বার্থ অতঃপর শরীয়ত” অর্থাৎ তার চাহিদা অনুযায়ী শরিয়ত হবে। এখন সে যদি পার্লামেন্টে নিজের স্বার্থ দেখতে পায় বা ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বের মধ্যে স্বার্থ খুঁজে পায় অথবা অন্য কোন বিষয়ে স্বার্থ খুজে পায়; তাহলে এটা বৈধ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

।।

এই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ইখওয়ান, যারা এই পদ্ধতিতে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, এই ব্যক্তিরা কখনোই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি ও পারবে না। আমাদের কাছে কিতাব-সুন্নাহ থেকে দলিল আছে, তারা কখনোই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। যদি কখনো তাদের কোন ধরনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয় যেমনটা সুদান ও সুদানের বাইরে (নব্বইয়ের দশকে) হয়েছে; তাহলে সেটা একেবারেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তখন এই ব্যক্তিরা হয়তো তাদের কাজ থেকে ফিরে আসবে এবং ইসলামের সঠিক মানহাজকে প্রতিষ্ঠা করবে অথবা তাদেরকে কয়েক বছরের ভিতর ধ্বংস করে দেয়া হবে*।

।।

এমনকি আলজেরিয়ান ভাইয়েরা (নব্বইয়ের দশকে) যখন বিজয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল এবং শহরগুলো উৎসবে প্লাবিত করছিল, তখন আমরা বলেছিঃ অবশ্যই এদের পতন হবে। তখন কেউই এই ধরনের কথা শুনতে চাইত না। আমরা তাদেরকে বলতামঃ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পাপাচারীদের কাজকে ইসলাহ করেন না) অতঃপর বাস্তবেই একটা সময় তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হয়েছে এবং তাদেরকে বিচ্যুত করা হয়।

।।

সংগঠনের উপাদান ও মানহাজের ভূমিকা (دور المنهج مقومات التنظيم و)

শাইখ আবু মুসআব আস-সুরি

*উল্লেখ্য শাইখের এই আলোচনা নব্বইয়ের দশকে পেশওয়ারে করা। মিশরে ইখওয়ান, এবং তিউনিশিয়ায় আন-নাহ্দার ঘটনায় আমরা তাঁর পর্যবেক্ষণের সত্যতার আরো প্রমাণ পেয়েছি।